সংস্কৃতির বিবর্তন
অন্নদাশঙ্কর রায়

সংস্কৃতির বিবর্তন

অন্নদাশঙ্কর রায়

ইংরেজীতে বলে পুরনো বোতলে নতুন মদ। শব্দটি হয়তো খ্রীস্টপূর্ব বিংশ শতাব্দীর। অর্থটি খ্রীস্টোত্তর বিংশ শতাব্দীর। অতি প্রাচীন ভাষা, অতি আধুনিক ভাব। মাঝখানের শতাব্দীগুলিতে তার বার বার অর্থান্তর ঘটেছে। শেষে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। তেমন যে শব্দ তারই পুনরুজ্জীবন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। তাঁর পুরোগামী কোনো কোনো মহারাষ্ট্রীয় সুধী। কালচার বোঝাতে 'কৃষ্টি' ব্যবহার করা উঠে গেছে। 'সংস্কৃতি'ই চলতি। সুতরাং আমিও চলতি হওয়ার পন্থী।

ইদানীং ইংরেজীর জায়গায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ধুম পড়ে গেছে। যেসব শব্দ সংস্কৃত অভিধানে নেই সেসব শব্দ উদ্ভাবন করা হচ্ছে। যেসব আছে সেসব শব্দের নতুন অর্থ করা হচ্ছে। পশ্চিম থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা পশ্চাতে ফিরে চলেছি। পশ্চিম বনাম পশ্চাৎ এর মধ্যে আমরা বেছে নিচ্ছি পশ্চাৎকে। এই যে অভিনব সংস্কৃতীকরণ এটা আধুনিক মানসের পক্ষে অস্বাভাবিক। বাস্তবের সঙ্গে এর গভীর ব্যবধান। আমরা যেন ভাজছি ঝিঙে বলছি পটল।

সংস্কৃত আর সংস্কৃতি একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলেও নিকট সম্পর্কীয় নয়। কৃষির সঙ্গেই কৃষ্টির তথা সংস্কৃতির নিকট সম্পর্ক। যে ফসল ফলেনি তাকে ফলানোই কৃষকের কর্ম। তার জন্যে সে মাঠ চষে। কালটিভেট করে। যা ফলে রয়েছে তাকে সিদ্ধ করে শুদ্ধ করে পরিবেশন করা হচ্ছে পাচকের কর্ম। সে রিফাইন করে। কালটিভেশন আর রিফাইনমেণ্ট এক নয়। সবাই যদি রিফাইনমেণ্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকে কালটিভেট করবে কে? নতুন ফসল ফলবে কী করে?

পুরনো বোতলে নতুন মদ থেকেই আমাদের রেনেসাঁস। পরে দেখা গেল তার বিপরীত দৃশ্য। নতুন বোতলে পুরনো মদ। ঐতিহাসিক পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের তফাৎ বোঝেন না। দার্শনিক ধর্মের সঙ্গে দর্শনের তফাৎ বোঝেন না। বৈজ্ঞানিক জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্যোতিষের তফাৎ বোঝেন না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসছেন তাঁরা গুরুর কাছে দীক্ষা নিচ্ছেন। কমিউনিস্টকেও দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজার আয়োজনে উদ্যোগী হতে লক্ষ্য করা যায়। সেইসূত্রে নাকি কমিউনিজমের বিস্তার হবে। অর্থাৎ চার্চের কাঁধে পা রেখে এঁরা স্টেট দখল করবেন। এটা ফরাসী বিপ্লবের তথা রুশ বিপ্লবের চিন্তাপ্রবাহের বিপরীত। মার্কসবাদ যাঁর নখদর্পণে তিনি পুরোহিততন্ত্র অব্যাহত রাখবেন!

আমরা ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছি যে দেশকে স্বাধীন করাই যথেষ্ট নয়, দেশের মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, সৃষ্টি করতে, নির্মাণ করতে শেখাতে হবে। পশ্চিমের সঙ্গে, আধুনিকের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। পশ্চাতের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা

করতে হবে। জনগণের সঙ্গে, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। সার্থক সংস্কৃতির এই তিনটি ডাইমেনসন। তৃতীয়টির দিকে আরো নজর দেওয়া দরকার।

প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে সংস্কৃতি হয় না। আবার প্রকৃতির থেকে দূরে সরে গেলেও সংস্কৃতি বাঁচে না। সংস্কৃত ভাষার মতো কৃত্রিম হতে হতে সংস্কৃতিও জীবনীশক্তি হারায়। ব্যাপক অনুকৃতি, তার প্রতিক্রিয়ায় বিকার ও বিকৃতি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠার লক্ষণ নয়। অবক্ষয়ের লক্ষণ। অতিরিক্ত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সংস্কৃতির পক্ষে মারাত্মক। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবেই। সংস্কৃত সাহিত্যও রাজসভায় ও মঠবাড়ীতে বা চতুষ্পাঠীতে নিবদ্ধ হয়েই অবশেষে নির্জীব হয়।

আমার এই প্রবন্ধগুলি একটানা লেখা হয়নি, এগুলির মধ্যে রচনার পৌর্বাপর্যও রাখা হয়নি। একটি প্রবন্ধ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা। তার পূর্বনাম 'সাহিত্যে সঙ্কট: পুনশ্চ'। কথা ছিল আমার 'সাহিত্যে সঙ্কট' বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে এটি সংযোজিত হবে। দ্বিতীয় সংস্করণের নিকট সম্ভাবনা নেই দেখে বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করছি। এখন এর নামান্তর 'সংস্কৃতির সন্ধিক্ষণ'। হয়তো কিছু গরমিল হবে। আর একটি কথা। বিভিন্ন প্রবন্ধে একই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। একটিকে বহাল রেখে বাকীগুলির থেকে বাদসাদ দিতে গেলে বহুক্ষেত্রে অঙ্গহানির ভয়। না দিলে পুনরাবৃত্তির অপবাদ। অঙ্গহানির চেয়ে অপবাদই মন্দের ভালো। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

৮ ডিসেম্বর ১৯৮৩

অন্নদাশঙ্কর রায়

সাহিত্যিক হিসাবে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, প্রথমত, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে। দ্বিতীয়ত, লোকসাহিত্যের সঙ্গে। তৃতীয়ত, ওপার বাংলার নব সাহিত্যের সঙ্গে। ওপার বাংলা বলা অবশ্য ঠিক নয়। বলা উচিত, প্রাকৃতিক বাংলাদেশের বা বঙ্গভাষী ভূভাগের বৃহত্তর অংশ। যার নাম ইদানীং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

আমাদের ভাবতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, এই বিচ্ছেদ তিনটি যাতে দূর হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বলতে বোঝায় রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যচরিতামৃত, ফারসী থেকে ভাবানুবাদ, হিন্দী থেকে ভাবানুবাদ, এই শতাব্দীতে আবিষ্কৃত চর্যাপদ বা বৌদ্ধ সাধন পদাবলী, নাথযোগীদের সাধনগীতি, বাউলদের সাধন-গীতি, মুসলমানদের পুঁথি সাহিত্য। প্রাচীন না বলে মধ্যযুগীয় বললে ঠিক হতো। 'প্রাচীন' শব্দটি এখানে 'পুরাতন' অর্থেই ব্যবহৃত। অর্থাৎ যা আধুনিক নয়, যা উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর নয়। শিকড় খুঁজতে হলে আমাদের পুরাতন বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই খুঁজতে হবে। সে সাহিত্যে বৌদ্ধ, নাথযোগী, মুসলমানদেরও দান ছিল। সাধারণত আমরা এসব দানকে উপেক্ষা করি। যেন বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র শাক্ত ও বৈষ্ণবদেরই একার সৃষ্টি। পুরাতন সাহিত্যেও কিছু সেকুলার কাহিনী ছিল। সেগুলি আরব্য উপন্যাস বা পারস্য উপন্যাস থেকে গৃহীত। আজকালকার সাহিত্যিকরা পুরাতন সাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিত নন। ফলে একটা বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে। এই ধরুন, আমার ছেলেবেলায় আমি 'গোলে বকাউলি'র কাহিনী শুনেছিলুম আমার ঠাকুমার মুখে। একখানা চটি বইও বোধ হয় ছিল আমাদের বাড়িতে। তা না হলে ঠাকুমা জানতেন কী করে?

তারপর লোকসাহিত্যের কথা। বাউল গীতিকে আমি লোকসাহিত্য বলিনে। বৈষ্ণব পদাবলীর মতো সেও সাধন মার্গের বাণী। তাকে বাদ দিলেও বিস্তর লোকগীতি আছে, লোকগাথা আছে, বচন প্রবাদ আছে, রূপকথা উপকথা আছে যা প্রধানত মুখে মুখে রচিত। মুখে মুখে প্রচারিত, সঞ্চারিত। ছাপাখানা ছিল না, তার আগে পাণ্ডুলিপিই ছিল না। মানুষের স্মৃতিই লোকসাহিত্যের কোষাগার। হাজার বছর পূর্বের কোনো ছড়া কি গান যদি এখনো লোকের মনে থাকে তবে তা বদলাতে বদলাতে বর্তমান রূপ নিয়েছে। সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ দুটি কাজ অত্যাবশ্যক। নয়তো বিলোপ অনিবার্য ও আশু। গ্রামের লোকেরাও আজকাল সিনেমার গান, যাত্রার গান, ডিটেকটিভ কাহিনী ইত্যাদির স্রোতে মজ্জমান। লোকসাহিত্যের প্রতি সে মমতা নেই। অথচ লোক-সাহিত্যের সঙ্গে জীবন্ত যোগ না থাকলে ভদ্র সাহিত্য রক্তহীন, স্বাদহীন, অগভীর হয়। সাধ্য থাকলে আমরাও লোকসাহিত্যে কিছু দান করে যেতে পারতুম। কিন্তু শহরে বসে তা সম্ভব নয়। গ্রামে একবার ঘুরে এলেও হয় না। দীর্ঘকাল বাস করতে হয়।

তারপর ওপার বাংলার সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া। মন মিলিয়ে নেওয়া। ভাব বিনিময় করা। পুস্তক বিনিময় করা। পত্রিকা বিনিময় করা। যাওয়া আসা। মেলামেশা। দুঃখের বিষয় এর কোনো কোনোটি সহজ নয়। সরকারী বিধিনিষেধ তো আছেই, মানসিকতাও বিমুখ। লৌহ যবনিকা মাঝখানে ঝুলছে। আমি বার বার চেষ্টা করেছি, বার বার ব্যর্থ হয়েছি। আরো অনেককে চেষ্টা করতে হবে।

সংস্কৃতির বিবর্তন সমস্তক্ষণ চলেছে। কোথাও তার ছেদ নেই। কিন্তু ইতিহাসে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে যাতে এক ধারা দুই ধারা হয়ে যায়, দুই ধারার বিবর্তন স্বতন্ত্রভাবে হয়। তেমন এক ঘটনা সাতচল্লিশ সালের দেশভাগ প্রদেশভাগ। ভারতের সংস্কৃতির কথা যখন ভাবি তখন মনে থাকে না যে এখনকার বাংলাদেশও তার অঙ্গ। বাংলার সংস্কৃতির কথা যখন ভাবি তখন খেয়াল থাকে না যে অধিকাংশ বাঙালী এখন বাস করে সীমান্ত-রেখার ওধারে। পূর্বাপর ধারাবাহিকতা একটা আছে নিশ্চয়, কিন্তু ভারত বাংলাদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের ধারাবাহিকতা একই খাতে প্রবহমান নয়। কলকাতায় বসে আমি দিল্লীর সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু ঢাকার থেকে বিযুক্ত। তাই সব বাঙালীর হয়ে চিন্তা করতে বা কথা বলতে পারিনে, সব প্রাক্তন ভারতীয়ের হয়েও নয়। বিবর্তনে একটা বিচ্ছেদ থেকে যাচ্ছে, ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। এর প্রতিকার খুঁজে বার করতে হবে।

৩ জানুয়ারি ১৯৮৯

অন্নদাশঙ্কর রায়

শিবনারায়ণ রায়
প্রীতিভাজনেষু

সূচীপত্র

সেটি একটি অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা। ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত অধ্যাপক বীর্যসুপার্থ শান্তিনিকেতনের একটি বৈঠকে প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দ প্রসঙ্গে একটি ভাষণ দেন। একটির পর একটি ছন্দ আবৃত্তি করেন। এতদিন পরে মনে থাকবার কথা নয় ছন্দগুলির নাম ও বর্ণনা। শুধু মনে আছে একটি চমৎকার ছন্দ ভারত থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বিদ্যমান ইন্দোনেশিয়ায়। আমরা সবাই বিস্মিত।

অধ্যাপকের সঙ্গে যখন আলাপ জমে যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করি বীর্যসুপার্থ কথাটার মানে কী। তিনি বলেন, "বীর অর্জুন। বীর্য মানে বীর। আর সুপার্থ মানে পার্থ। আমরা নামের পূর্বে সু উপসর্গ ব্যবহার করি। যেমন, ধরুন, সুকর্ণ।" লক্ষ্য করেছি যে কেউ কেউ প্র উপসর্গ ব্যবহার করেন। যেমন প্রহস্ত। শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্র। তারও দেশ ইন্দোনেশিয়া। তার সঙ্গে দেখা আরো আগে। একবার একটি কন্যার সঙ্গেও আমার পরিচয় হয় ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে। কেরল কলামণ্ডলমে কথাকলি নৃত্য শিক্ষা করতে এসেছিলেন। নাম রত্না। ধাম জাভাদ্বীপ। সংস্কৃত নামকরণ কেবল পুরুষদের বেলা নয়, নারীদের বেলাও প্রশস্ত।

এবার প্রশ্ন ওঠে, "এঁরা কি হিন্দু?" না, হিন্দু নন। রত্না বোধ হয় খ্রীস্টান, জিজ্ঞাসা করিনি। চেহারা থেকে অনুমান হয় মাতা কিংবা পিতা ইউরোপীয়। অন্য দু'জন মুসলমান। হ্যাঁ, বীর্যসুপার্থ মুসলমান। প্রহস্ত মুসলমান। শুনে চমকে উঠতে হয় বইকি। গত সাতশো বছরে ইন্দোনেশিয়ার সব ক'টি দ্বীপই অহিন্দু হয়ে গেছে। হয়নি কেবল বালি। কী জানি কেমন করে সে হিন্দু রয়ে গেছে। শান্তিনিকেতনে বালিদ্বীপের ছাত্র ছিল একজন। তার নাম ইদা বাগুস মন্ত্র। ইদা বাগুস মানে কী মনে পড়ছে না। মন্ত্র শব্দটি সংস্কৃত। এখানে পরিষ্কার করে বলে রাখতে চাই যে বালিদ্বীপের হিন্দুরা কেউ সিংহলের হিন্দুদের মতো ভারত থেকে দেশান্তরিত নয়। তারা স্বেচ্ছায় হিন্দু বা বৌদ্ধ হয়েছিল, পরে মুসলমান বা খ্রীস্টান হয়। কিন্তু ধর্মে বিভিন্ন হলেও সংস্কৃতিতে এক ও অভিন্ন। সেক্ষেত্রে তারা সকলেই হিন্দু ঐতিহ্যের অনুসরণ করে এসেছে। রামায়ণ মহাভারত তাদের প্রিয়। তাদের নৃত্য গীত, তাদের নাট্য, তাদের চিত্রকলা রামায়ণ মহাভারত অনুপ্রাণিত। সুকর্ণ তাঁর দরবার কক্ষে অর্জুনের প্রতিকৃতি রাখতেন, শুনেছি।

আমাদের অনুরোধে মন্ত্র নামক যুবকটি একদিন আমাদের বাড়ীতে বালিদ্বীপের পোশাক পরে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করে। সেটিও একটি অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা। কিন্তু তার খুঁটিনাটি ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে আশ্চর্য বর্ণাঢ্য পোশাক। ভাষা একেবারেই দুর্বোধ্য। সংস্কৃত শব্দ এখানে ওখানে ছিটানো থাকলেও সংস্কৃতবংশীয় নয়, মালয়বংশীয়।

বালিদ্বীপের লোক ধর্মে হিন্দু, সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, সংস্কৃতিতে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী। আর জাভাদ্বীপের লোক ধর্মে মুসলমান, সমাজে বর্ণাশ্রম-বিহীন, সংস্কৃতিতে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী। মন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি সে ব্রাহ্মণ পুরোহিতসন্তান। ব্রাহ্মণদের চার বিবাহ। চার বর্ণের স্ত্রী। ক্ষত্রিয়দের তিন বিবাহ। ব্রাহ্মণ বাদে তিন বর্ণের স্ত্রী। বৈশ্যদের দুই বিবাহ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বাদে দুই বর্ণের স্ত্রী। শূদ্রদের এক বিবাহ। স্ববর্ণের স্ত্রী। মার্কসবাদীরা এর কী ব্যাখ্যা দেবেন জানতে ইচ্ছা করে। মন্ত্র আমাকে হাসিমুখে আশ্বাস দেয় যে বহুবিবাহের দিন গেছে। ওর প্রজন্মের পুরুষরা কেউ ও প্রথা মানবে না।

অধ্যাপক বীর্যসুপার্থ দেশে ফিরে গিয়ে চিঠি লেখেন তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। নাম রেখেছেন "আর্যাবর্তপুত্র জয়বিষ্ণুবর্ধন"। আমি তো হাঁ! নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, শিশুটি মাতৃগর্ভে আসে ভারতবর্ষে অর্থাৎ আর্যাবর্তে। অতএব সে আর্যাবর্তপুত্র। কিন্তু জয়বিষ্ণুবর্ধন কেন হলো তার মর্ম অব্যক্ত থেকে গেল। একটি মুসলিম বালকের নাম আর্যাবর্তপুত্র জয়বিষ্ণুবর্ধন শুনে হিন্দুস্থানের মুসলমানরা বিশ্বাস করবেন না যে তার পিতা সত্যিই মুসলমান। তাঁরা রুষ্ট হবেন। কিন্তু এর পরে যা বলব তা শুনে তাঁরা হৃষ্ট হবেন। বছর কয়েক বাদে কে একজন আমাকে খবর দেন যে অধ্যাপক মহাশয় খাঁটি মুসলমানের মতো বিবি তালাক করেছেন। তাঁর স্ত্রীকে আমার মনে পড়ে। অতি নিরীহ নির্দোষ মহিলা। আমি তো আবার হাঁ!

ইন্দোনেশিয়া থেকে আজকাল শান্তিনিকেতনে কেউ আসেন না। না অধ্যাপক, না ছাত্র। তবে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়নি। বছর কয়েক আগে যোগ্যকর্তায় না কোথায় যেন রামায়ণ উৎসব হয়। যোগ দিতে যান আমাদের প্রখ্যাত অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। উৎসবের আয়োজন করেন যিনি তিনি আর কেউ নন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ইদা বাগুস মন্ত্র। ততদিনে তিনি ইন্দোনেশিয়ার পুরাতত্ত্ব না প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক। নিমন্ত্রিত হয়ে বহু দেশের বিদ্বানরা সমবেত হন। রামায়ণ মহাভারত তো শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। কিংবা কেবলমাত্র ইন্দোনেশিয়ায় প্রসারিত নয়। সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে তাদের বিস্তার। একদা এরা সবাই হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাস করত। কিন্তু বহু লোক পরে মুসলমান বা খ্রীস্টান হয়ে যায়। এখনো বৌদ্ধ ধর্ম কয়েকটি দেশে তার ঘাঁটি রক্ষা করছে। হিন্দুও আছে কয়েকটি পকেটে। কবে এরকম হলো, কেন এরকম হলো, তার ইতিহাস আমরা জানিনে। জানতে হলে শুধু একবার ঘুরে আসা যথেষ্ট নয়। দীর্ঘকাল বসবাস করতে হবে। মেলামেশা করতে হবে। পড়াশুনা করতে হবে। গবেষণা করতে হবে। ওসব দেশ থেকে অধ্যাপক গবেষক আনিয়ে নিতে হবে। পুঁথিপত্র ও শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে।

রামায়ণ মহাভারত আমাদের দেশে ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়েছে। বোধহয় গোড়ায় ছিল হোমারের ইলিয়াড অডিসির মতো কাহিনী ও কাব্যগ্রন্থ। সম্ভবত সেই আকারেই ভারতের বাইরে চালান যায়। সেখানে সেই আকারেই প্রচলিত হয়। ভারতে তাদের বিবর্তন ও বাইরে তাদের বিবর্তন একভাবে হয়নি। একথা মনে রাখলে বুঝতে কষ্ট

হয় না কেন ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান ও ইন্দোচীনের বৌদ্ধ রামায়ণ মহাভারতকে সযত্নে রক্ষা করেছে। ইসলামবিরুদ্ধ বা সদ্ধর্মবিরুদ্ধ বলে বর্জন করেনি। আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম কোনো ধর্মই সেসব দেশে বিজেতার ধর্ম রূপে যায়নি। সেখানকার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় শৈব বা বৈষ্ণব, বৌদ্ধ বা মুসলিম হয়েছে। বিজেতার ধর্মরূপে যায় খ্রীস্ট ধর্ম। কিন্তু ওলন্দাজ শাসকরা জোর করে ধর্মপ্রচার করেননি। ততদিনে ইউরোপে ধর্মের যুগের পরিবর্তে যুক্তির যুগের প্রবর্তন হয়েছে। আর ওলন্দাজ শাসকদের লক্ষ্য তো ছিল বাণিজ্য। বাণিজ্যকে বিপন্ন করে খ্রীস্টধর্ম প্রচার ইংরেজ বা ওলন্দাজ কারো জাতীয় নীতি ছিল না। বিজেতা হলেও তাদের সাম্রাজ্য ছিল বণিকের সাম্রাজ্য। সুতরাং খ্রীস্টান হলেও ইন্দোনেশিয়ানরা রামায়ণ মহাভারত ও তাদের আনুষঙ্গিক সঙ্গীত নাটক নৃত্য থেকে বিরত হয়নি। একই কথা বলতে পারা যায় ইন্দোচীনবাসীদের সম্বন্ধেও।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। 'ইন্দো' কথাটা এসেছে 'ইন্দোস' থেকে। সেটা গ্রীক ভাষার শব্দ। তার থেকেই এসেছে 'ইণ্ডিয়া'। কিন্তু 'ইণ্ডিয়া' তথা 'ভারত' নয়। 'দ্বীপময় ভারত' একটা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতের ভূগোলে ইতিহাসে পুরাণে কাব্যে ইন্দোনেশিয়া বা ইন্দোচীনের উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। ইণ্ডিয়ার সীমানা গ্রীকদেরও সম্যক জানা ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ইণ্ডিয়া আবিষ্কারের ধুম পড়ে যায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে। সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল আরবদের একচেটে। ভারত থেকে তারা যা নিয়ে গিয়ে ইউরোপে চালান দিত তার জন্যে অসম্ভব দাম হাঁকত। দিক্ ভ্রম করে যারা আমেরিকায় পদার্পণ করে তারা তাকেই ঠাওরায় ইণ্ডিয়া। সেখানকার তৎকালীন অধিবাসীদের বলে ইণ্ডিয়ান। এখনো সেই নামে তাদের বংশধরদের নামকরণ। ভারত থেকে কেউ যখন আমেরিকায় গিয়ে ইণ্ডিয়ান বলে আপনার পরিচয় দেন তখন সেখানকার শ্বেতাঙ্গরা মনে করেন রেড ইণ্ডিয়ান। কাজেই তফাৎ বোঝাবার জন্যে বলতে হয় হিন্দু। এটা কিন্তু ধর্মীয় অর্থে নয়। একবার এক আমেরিকান মহিলা এক অতিথির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "এই হিন্দু ভদ্রলোকটি একজন মুসলমান।" আরবরাও ধর্মনির্বিশেষে ভারতীয়দের সবাইকে বলে 'হিন্দী'।

একদল ইউরোপীয় যেমন আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের ইণ্ডিয়ান বলে ভুল করে তেমনি আরেকদল জাভা সুমাত্রায় গিয়ে সেসব দ্বীপের অধিবাসীদের মনে করে ইণ্ডিয়ান। এখনো সেই ভুল তাদের লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। জাভার পটভূমিকায় লিখিত ওলন্দাজ আমলের একটি উপন্যাসে ইণ্ডিয়ান শব্দটির ব্যবহার দেখে চমকে উঠি। যাদের বিষয়ে লেখা তারা মুসলমান। তবে কি তারা ভারতীয় মুসলমান? জাভায় গেছে বসবাস করতে? তা নয়। তারা জাভাদ্বীপের দেশীয় মুসলমান, কোনো কালেই ভারতীয় ছিল না। কিন্তু ওলন্দাজদের বিচারে ইণ্ডিয়ান। যেহেতু তাদের দ্বীপপুঞ্জের নাম ইস্ট ইণ্ডিজ বা ইস্ট ইণ্ডিয়া আইল্যাণ্ডস। পৃথিবীর একপ্রান্তে যেমন ইস্ট ইণ্ডিজ তেমনি অপর প্রান্তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া আইল্যাণ্ডস। এইসব নামকরণ কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা প্রভৃতি নাবিকদের ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের ধারণা ছিল

এসব দ্বীপও গ্রীকদের বর্ণিত ইণ্ডিয়ার সামিল। আর এই ভুল ধারণার থেকে সংগঠিত হয় ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, হল্যাণ্ডের, পর্টুগালের, ডেনমার্কের, জার্মানীর ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। বণিকরাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়েন জাহাজ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করতে। এখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া হচ্ছে তাই যা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া বা আমেরিকা নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়ার অবস্থান পূর্ব গোলার্ধে। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার পশ্চিম গোলার্ধে।

নাবিকদের পর বণিকদের পালা। বণিকদের পর শাসকদের পালা। বহুসংখ্যক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর থেকে একটিকেই আমরা চিনি, তাকেই মনে করি একমাত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তা নয়। ভারতের বাণিজ্যে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্টুগীজদেরও অংশ ছিল। কেউ বিতাড়িত হয়, কেউ নিজের অংশ বেচে দেয়, কেউ পণ্ডিচেরী বা গোয়া প্রভৃতি কয়েক জায়গায় টিকে থাকে, সকলের উপর টেক্কা দেয় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কিন্তু ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মালয়, সিঙ্গাপুর, বোর্নিওতেও বাণিজ্য করত। এসব অঞ্চলও ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়ার অন্তর্গত। ইস্ট ইণ্ডিয়ার আদি অর্থ পূর্ব ভারত নয়। ইংরেজদের কাছে তার অর্থ ছিল সুদূরপ্রসারী। তেমনি ফরাসীদের কাছেও। ইন্দোচীনকেও তারা ইস্ট ইণ্ডিয়ার সামিল মনে করত। ফরাসীরা এখন কী লেখে জানিনে, কিছুদিন আগেও যা লিখত তার অর্থ ইণ্ডিয়াসমূহ। বহুবচন। যার অন্তর্গত ইন্দোচীন তথা পণ্ডিচেরী। পর্টুগীজদের ইণ্ডিয়ার মধ্যে পড়ে গোয়া থেকে আরম্ভ করে তিমোরের একাংশ। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে বিভিন্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিভিন্ন এলাকায় একচেটে কারবার করে। পরে একচ্ছত্র শাসন।

বাণিজ্য পর্বের পর শাসন পর্বেই বুঝতে পারা যায় এক এক দেশের এক এক ইতিহাস। এক এক ঐতিহাসিক নাম। তখন ইন্দোনিশিয়া, ইন্দোচীন, মালয় প্রভৃতি ইণ্ডিয়াগুলি ফারাক হয়ে যায়। আমরাও ইণ্ডিয়ার সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করি ভারতবর্ষ। তার আগে চলতি ছিল হিন্দুস্থান বা ইন্দোস্তান। ইংরেজদের কাগজপত্রেও এটার ব্যবহার দেখা যায় সিপাহীবিদ্রোহের পরেও। ফারসী যতদিন রাজভাষা ছিল ও দিল্লীর বাদশাহ যতদিন নামমাত্র সম্রাট ছিলেন ততদিন হিন্দুস্থানই ছিল সাধারণবোধ্য নাম। ইংরেজী তখনকার দিনে ক'জনই বা পড়ত, ক'জনই বা বুঝত! ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন সংস্কৃতই বা পড়ত ক'জন! বুঝত ক'জন! বাংলা কাব্যের কোথাও কোথাও ভারত শব্দের সাক্ষাৎ মিলত। কিন্তু ভারত বলতে সসাগরা ভারত অবধি বোঝাত। সাগরপারের ভারত নয়। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় হিন্দুরা কেউ সাগর পারাপার করত না। মুসল-মানরা করত। তারা যেত মক্কায় হজ করতে। ভাস্কো-ডা-গামাকে মোজাম্বিকের মালিন্দী বন্দর থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে যে ভারতীয় পাইলট সে ব্যক্তি সম্ভবত কেরলবাসী মুসলমান। কিন্তু বলা যায় না, হিন্দুও হতে পারে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, হিন্দুরা বোধ হয় এটা কোনোদিন ভুলে যায়নি, বিশেষত উপকূলবর্তী হিন্দুরা। তা নইলে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বর্ণনা থাকত কেন? আর বাংলার রূপকথায় সাত সমুদ্র তেরো নদী এতবার আসত কেন? ওড়িশার রূপকথায় যে সাধকদের উল্লেখ পাওয়া যায়

তারা বাংলার সাধুদের মতোই সমুদ্রগামী। সেদিন এক গবেষক লিখেছেন ওড়িশার অসংখ্য মন্দিরের পেছনে যে অপরিমিত অর্থব্যয় হয়েছে তা প্রজাদের দেওয়া রাজস্ব থেকে নয়, সাগরপারের বাণিজ্যের লাভ থেকে। এখানে সাগরপার মানে বর্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া। প্রথমে আরবরা, পরে ইউরোপীয়রা এসে উপকূলবর্তী ভারতীয়দের কোণঠাসা করে। তাছাড়া তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বড়ো বড়ো বন্দরগুলিও সমুদ্রগামী জাহাজের অনুপযোগী হয়ে ওঠে।

গ্রীকদের কল্যাণে আমরা ইণ্ডিয়ান, পারসিকদের কল্যাণে হিন্দু, তুর্ক ও মোগলদের কল্যাণে হিন্দুস্থানী আর ইংরেজী শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীদের কল্যাণে ভারতীয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগের সাহিত্যে ভারতের উল্লেখ থাকলেও ভারতীয়ের উল্লেখ নেই। আগেকার দিনের পরিচিতি হতো জাতবাচক, জাতিবাচক নয়। অর্থাৎ কাস্ট অনুসারে, নেশন অনুসারে নয়। অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার ধারণা ঊনবিংশ শতকেই সঞ্জাত হয়। ভারতের বাইরেও যে বৃহত্তর ভারত ছিল এ ধারণা বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় ধারণাটি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমাদের মুখে বৃহত্তর ভারতের বুলি শুনে বর্মী, সিংহলী, মালয়েশীয় ইন্দোনেশীয়রা মহাবিরক্ত। ওদের বিশ্বাস আমরাও ইউরোপীয়দের মতো আরো একপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী। তাই সম্পর্কটা যেমন মধুর হবে আশা করা গেছল তেমন মধুর নয়। ইন্দো আর হিন্দু এই দুটি শব্দ যদি একার্থক হয় তবে ইন্দোচীনের বৌদ্ধ, ইন্দোনেশিয়রা মুসলমান আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করবে না। আত্মীয়তাটা তো ধর্ম থেকে নয়, সংস্কৃতি থেকে। আর সংস্কৃতি যদিও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তবু তার নিজের ক্ষেত্রে স্বরাট। যেখানে ধর্মের বন্ধন নেই সেখানেও সংস্কৃতির বন্ধন থাকতে পারে। তার নতুন নিদর্শন সাম্রাজ্যহীন ইংলণ্ডের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের ভাষাভিত্তিক ঘনিষ্ঠতা। ইংরেজী বইয়ের চাহিদা বেড়ে গেছে। বিদেশ থেকে আসে, এদেশেও প্রকাশিত হয়।

যারা ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী নয় তারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রহণশীল এটা আমাদের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে। পার্শীরা হিন্দু না হয়েও গুজরাটী হয়ে গেছে, তার পর তাদের অনেকে ইউরোপীয় হয়েছে। উত্তর ভারতের বনেদী হিন্দু পরিবারের মাতৃভাষা উর্দু, নামকরণও পারসিক ভাষায়। খুশবখ্‌ত রায়ের পুত্র ইকবাল বখ্‌তকে তাঁর মুসলিম বন্ধুরা তাঁদেরই একজন বলে ধরে নিয়েছিলেন। পরে জানতে পেলেন তিনি হিন্দু কায়স্থ। তাঁদের বংশের নামকরণ তিন শতাব্দী ধরে পারসিক পদ্ধতিতে হয়ে এসেছে। এ ধরনের নাম ইসলামী নাম নয়। তফাৎ আছে। জবাহরলাল নেহরু—এর কোন্ শব্দটা সংস্কৃত থেকে নেওয়া? মোতিলালও পারসিক। আমীরচাঁদ, আমিনচাঁদ, শাদীলাল, পেয়ারেলাল, শের সিং, খুশবন্ত সিং, দারা সিং, দরবারা সিং, এঁরা হিন্দু কিংবা শিখ, কিন্তু এঁদের নামের আধখানা পারসিক। পারসিক ভাষা ইংরেজীর আগে আমাদের রাজভাষা ছিল প্রায় সাতশো বছর ধরে। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম কবুল না করে পারসিক সংস্কৃতির সঙ্গে সমঝোতা করেন। আর তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা বহুক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত হয়, অথচ, কী আশ্চর্য, ইন্দোনেশিয়ার মতো সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য রক্ষা করে।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের ধর্মের মিল থাকা সত্ত্বেও ভাষার প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সংস্কৃতির প্রশ্ন। বাংলাদেশের জনসাধারণ যে সংস্কৃতিতে লালিত হয়েছে সেটা তাদের দু'তিন হাজার বছরের লোকসংস্কৃতি। তাতে সংস্কৃতের ভাগও কম। পারসিকের ভাগ তো আরো কম। রামায়ণ মহাভারতে বাংলার মুসলমানদের ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের মতো রুচি নেই। কিন্তু মনসার ভাসান, বেহুলার কাহিনী, রাধাকৃষ্ণের লীলা, লক্ষ্মীর পাঁচালি, শিবের গাজন, নবান্ন প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে মাতায়। এসব প্রসঙ্গে বিস্তর গান আছে যাদের পদকর্তারা ধর্মে মুসলমান, কিন্তু সংস্কৃতিতে বাঙালী। বাউল ও কবি গান ধর্মাশ্রিত। সে ধর্মে হিন্দুত্বের বা ইসলামের গোঁড়ামি নেই। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীতে যেমন সমঝোতার প্রয়াস একভাবে হয়েছে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীতেও তেমনি আরেক ভাবে। কবি গানে হিন্দুদের পুরাণ প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সেখানে গোমানী দেওয়ানকে পরাস্ত করে কার সাধ্য! পুরাণের তিনি অন্ধিসন্ধি জানতেন। তেমনি হিন্দু কবিয়ালরাও আরব পারস্যের সুপ্রচলিত উপাখ্যানগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

ইংরেজ আমলের গোড়ায় খ্রীস্টান মিশনারিদের এদেশে ঢুকতে দেওয়া হতো না। পরে তাঁদের কার্যকলাপে হিন্দুপ্রধানরা আতঙ্কিত হন। ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীষ্টীয় দীক্ষা তাঁদের মতে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তাই ইংরেজী শিক্ষাকেও শতহস্ত দূরে রাখেন। কিন্তু ক্রমশ বোঝা গেল ইংরেজী শিখলেই ছেলেরা সবাই খ্রীস্টান হয়ে যায় না। তবে কেউ কেউ সাহেবিয়ানা ও বিবিয়ানা পছন্দ করে। ধর্মান্তরের ভয়টা ভেঙে যায়, কিন্তু সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যলোপের আশঙ্কাটা বাড়ে। ছেলেরা দলে দলে বিলেত যায়, জাত খোওয়ায় না, কিন্তু "বিলিতী ধরনে হাসে, ফরাসী ধরনে কাশে, পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড্ডই ভালোবাসে"। আরো ভয়ঙ্কর কথা, "স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরায়"। এর পরে আসে স্বাদেশিকতার চেতনা, বর্জন করতে হবে শুধু বিদেশী বস্ত্র নয়, বিদেশী লবণ নয়, সেইসঙ্গে বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতি, মায় ইংরেজী শিক্ষাও। এঁদের আদর্শ প্রাচীন ভারত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম।

এটাও একজাতের গোঁড়ামি। দেশ থেকে এঁরা শুধু ইংরেজীকে বিদায় করবেন না, আধুনিক যুগকেও করবেন। ইংরেজ বিদায় হয়েছে, কিন্তু আধুনিক যুগ তার পরে তার ভালোমন্দ নিয়ে আরো জোরে চেপে বসেছে। এখন বাড়ীর চাকররাও টেরিলিনের ট্রাউজার্স পরে, ঝি-রাও পরে ম্যাকসি আর মিনি। তার জন্যে চায় আরো মজুরি। না দিলে ধর্মঘট। অর্থাৎ কর্মত্যাগ। তখন কর্তাকেই যেতে হয় বাজার করতে, গিন্নীকেই হাঁড়ি ঠেলতে হয়। সামনে আসছে উল্ট পুরাণের যুগ। তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণী তার জন্যে ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত হচ্ছেন। সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটবেই, কিন্তু কাদের কথামতো ঘটবে? যাদের কথামতো ঘটবার সম্ভাবনা তারা যদি একধার থেকে আন্তর্জাতিক পোশাক পরে, আন্তর্জাতিক সুরে নাচে, আন্তর্জাতিক মতবাদ আওড়ায় তা হলে সেটা হয়তো আধুনিক যুগের সঙ্গে মিলবে, কিন্তু দেশীয় ধারার সঙ্গে অন্বয় রাখবে কি? একবার এক চিত্রপ্রদর্শনীতে গিয়ে আমার জানতে ইচ্ছা করে, "এর মধ্যে দেশ কোথায়?

এর সবটাই কি কাল ? এটা কোন্ দেশের ছবি ? এই চিত্রকর কোন্ দেশের আর্টিস্ট ?"

আমাদের বাল্যকালের ইণ্ডিয়ান আর্টকে আমরা অনেক দূর পেছনে ফেলে এসেছি। আর সেখানে ফিরে যাবার উপায় নেই। অথচ পশ্চিমের পরিবর্তনশীল আর্টের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতেও কষ্ট হচ্ছে। সাহিত্য সম্বন্ধেও একই কথা। আধুনিকদের সঙ্গে আধুনিক না হয়ে আমাদের গতি নেই, আর গতিই পরম ধর্ম। জাপান তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। অথচ জাপানে গিয়ে দেখি তারা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের জোড় মেলাতে পারছে না, আধুনিকতার বেদীমূলে ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করছে। জাপানের আত্মা দ্বিধাবিভক্ত। এটা অস্বস্তিকর তথা অস্বাস্থ্যকর। আমাদের বিবর্তন যদি জাপানের পথ ধরে তবে আমাদের সাহিত্যিক তথা শিল্পীদের সামনেও আছে একই অস্বস্তি ও একই অস্বাস্থ্য। তবে এখনো এটা নির্দিষ্ট হয়ে যায়নি যে ভারত জাপানের পথ ধরবে। আমাদের সাম্যবাদী বন্ধুদের বিশ্বাস সমাজবিপ্লবের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য তত্ত্ব নিহিত আছে যে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হবে না। হলে ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ধারাভঙ্গ হবে। ঐতিহ্য হবে যাদুঘরে সংরক্ষণের বস্তু। আর আধুনিকতার যাত্রা নিষ্কণ্টক হবে।

বছরকয়েক আগে রোমানিয়া থেকে একজন সাহিত্যিক এসেছিলেন ভারত ভ্রমণে। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। তিনি বলেন, "ইউরোপের ইতিহাসে তিন তিনবার ধারাভঙ্গ ঘটেছে। আপনাদের তিন হাজার বছরের ইতিহাসে একবারও ঘটেনি।" এই বলে তিনি বুঝিয়ে দেন ইউরোপের তিনবার মানে, একবার খ্রীস্টধর্ম এসে গ্রীক রোমক ধারাভঙ্গ ঘটায়, আরেকবার রেনেসাঁস হয়ে খ্রীস্টধর্মকেন্দ্রিক ধারাভঙ্গ ঘটে, শেষের বার ধারাভঙ্গ ঘটে মার্কসবাদী সমাজবিপ্লব থেকে। এটা অবশ্য ইউরোপের সর্বত্র নয়। আমি ভারতের ইতিহাসে ধারাভঙ্গের নিদর্শন দেখাতে পারিনে। পরে ভেবে দেখেছি ভারতের ইতিহাস আর ইসলামের ইতিহাস যেখানে কাটাকুটি করেছে, জোড় মেলাতে পারেনি, সেইখানেই বোধহয় একপ্রকার ধারাভঙ্গ ঘটেছে। ভারতের ইতিহাস আর ইউরোপের ইতিহাস যেখানে কাটাকুটি করেছে, জোড় মেলাতে পারেনি, সেখানেও একপ্রকার ধারাভঙ্গ ঘটতে পারত, যদি ইংরেজেরা এদেশে থাকতে আসত। তারা কিছু দিয়ে গেছে, কিছু নিয়ে গেছে, এইটুকুর নাম ধারাভঙ্গ বা ডিস্কন্টিনিউইটি নয়। আমাদের রেনেসাঁসও অসমাপ্ত। কারো কারো মতে সবটাই ফাঁকি ও সবটাই বাকী।

ভারতের সংস্কৃতি ভারতের বাইরেও বহুদূর পরিব্যাপ্ত ছিল। কোথায় ইন্দোনেশিয়া, কোথায় ইন্দো-চীন, কোথায় তিব্বত, কোথায় সিনকিয়াং, কোথায় আফগানিস্থান, যেদিকেই চোখ ফেরাই সেদিকেই দেখি ভারতীয় সংস্কৃতির বটবৃক্ষের ঝুরি। ভারতের লোক ভুলে গেছে কবে কারা সেসব দেশে গিয়ে সংস্কৃতি বিস্তার করেছিল, কিন্তু সেসব দেশের লোক এখনো ভোলেনি কিংবা ভুলে গেলেও সজ্ঞানে কীর্তিলোপ করেনি। ইসলাম তো মন্দির ও মূর্তিভঙ্গের জন্যে প্রসিদ্ধ, অথচ আফগানিস্থানের বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি এখনো সযত্নে রক্ষিত। আর জাভাদ্বীপের বোরোবুদর। এখানে বলে রাখি কালাপাহাড়ীতে খ্রীস্টানরাও কম যায় না। প্রাচীন গ্রীক রোমক কীর্তি তারাও একদা ধ্বংস করেছে বা অন্য কাজে লাগিয়েছে। তা সত্ত্বেও যা টিকে গেছে তা এখন তাদেরই বংশধরদের দ্বারা অমূল্য উত্তরাধিকার রূপে সাদরে সংরক্ষিত।

ভারতের বাইরে পরিব্যাপ্ত ভারতীয় সংস্কৃতি অবিমিশ্র আর্য বা অবিমিশ্র বৈদিক বা অবিমিশ্র বৌদ্ধ বলতে পারা যায় না। জাতি ও ধর্ম এক্ষেত্রে গৌণ। পরিব্যাপ্তির পূর্বেই নানা জাতির ও নানা ধর্মের মিশ্রণ বা সমন্বয় ঘটেছিল সংস্কৃতির মূল ভূখণ্ডেই। ভারতের সংস্কৃতি যতই প্রাচীন হোক না কেন তার পূর্বেও প্রাচীনতর ছিল। সেই যে প্রাচীনতর সেটা আর্যপূর্ব, বেদপূর্ব ও বুদ্ধপূর্ব। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ভারতে ও ভারতের বাইরে যে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ধার করেছে তা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিলুপ্ত সংস্কৃতির অস্পষ্ট ও আংশিক একটি আলেখ্য রচনা করতে সাহায্য করছে। মোটামুটি বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মোহেনজো-দরো আর হরপ্পার মতো নগর ও বন্দর সিন্ধু উপত্যকাতেই নিবদ্ধ ছিল না। আরো পুব দিকে ও আরো দক্ষিণ দিকেও একই প্রকার প্রত্নবস্তু মিলেছে। আবার আরো পশ্চিমে অর্থাৎ ভারতের বাইরেও যে অনুরূপ প্রত্নবস্তু পাওয়া যাচ্ছে না তা নয়। ভারত তো একটা দ্বীপ নয়। একটা মহাদেশের অঙ্গ। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতা বিশুদ্ধ ভারতীয় না হয়ে কন্টিনেন্টালও হতে পারে। অর্থাৎ কেবল ভারতের একার না হয়ে আরো অনেকেরও হতে পারে। নিকটেই তো সুমেরীয় সভ্যতা ছিল। আর একটু দূরে চৈনিক। আরো দূরে ছিল মিশরীয়। এই চারটিই সব চেয়ে প্রাচীন। সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটি আলাদা শব্দ হলেও প্রাগৈতিহাসিক প্রসঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব নয়। পরে তাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বাড়ে। এখন আমরা সভ্যতা শব্দটি কম জায়গায় ব্যবহার করি, সংস্কৃতি শব্দটি সব জায়গায়। এ দুটি শব্দ সিভিলাইজেশন ও কালচারের পারিভাষিক শব্দ। মূল শব্দ দুটির উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে। পারিভাষিক শব্দ দুটির জন্ম উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে। বাংলায় লিখলেও আমরা

ইংরেজীর সঙ্গে মিলিয়ে নিই।

ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলগুলি বরাবরই বাইরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক কালেও ছিল একটা না একটা বহির্ভারতীয় সাম্রাজ্যের সামিল। যেমন পারস্য সাম্রাজ্যের, গ্রীকবংশী সাম্রাজ্যের, শক সাম্রাজ্যের, কুশান সাম্রাজ্যের, হূন সাম্রাজ্যের। আর্যভাষী ট্রাইবগুলি বাইরে থেকে এসেছিল কি না তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু এটা তো তর্কাতীত যে পারসিক, গ্রীক, শক, কুশান, হূনরা বাইরে থেকে এসে এক দেহে লীন হয়েছিল। অনুমান করতে আপত্তি কী, আর্যভাষীরাও একই দেহে লীন হয়েছিল আরো আগে থেকেই? একদা পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে আর্যভাষী মাত্রেই এক জাতি বা রেস। এখন সে থিয়োরি পরিত্যক্ত হয়েছে। আর্য ভাষায় কথা বললেই আর্যবংশীয় হয় না। বাংলাভাষা আর্যভাষা, কিন্তু বাঙালী জাতি কি আর্য? আর্য বলে কোনো জাতি যদি কখনো বিশুদ্ধ আকারে থেকে থাকে তবে তা দাস বা দস্যু জাতির সঙ্গে বা অন্যান্য অনার্য জাতির সঙ্গে এক দেহে লীন হয়েছে। যা রেখে গেছে তা কয়েকটি আর্য ভাষা। সে রকম ভাষা ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিস্তৃত। অথচ ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রচলিত নয়। তামিল বা তেলেগুর সঙ্গে সংস্কৃতের মিশাল ঘটলেই তা আর্যভাষায় পরিণত হয় না। সে রকম মিশাল সিংহলী, বর্মী, মালাই ভাষার সঙ্গেও ঘটেছে। সংস্কৃত ছিল সেকালের শিক্ষিত শ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষার ভাষা। কিন্তু কারো মাতৃভাষা নয়। অন্তত দক্ষিণে তো নয়ই। একালে যেমন ইংরেজী হয়েছে শিক্ষাদীক্ষার ভাষা। কেউ তার ফলে ইংরেজে পরিণত হয়নি। আর্য শব্দটি সেকালে ব্যবহার করা হতো সম্ভ্রান্ত অর্থে। স্ত্রী স্বামীকে বলত 'আর্যপুত্র'। মহিলাদের সম্বোধন করা হতো 'আর্যে' বলে। এর থেকে জাতি বা ভাষার নামকরণ সঙ্গত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এরূপ নামকরণের নজির নেই। আর্য তো আমাদের প্রতিবেশী ইরান দেশবাসীরাও। 'ইরান' শব্দটি আর্য বা আরিয় শব্দেরই অনুরূপ। তেমনি আয়ারল্যাণ্ডের প্রকৃত নাম 'এইরা'। যার থেকে হয়েছে 'আইরিশ'।

ভারতের মানুষ কোনো কালেই অবিমিশ্র আর্য জাতীয় বা আর্যভাষী ছিল না। কোনো কালেই অবিমিশ্র সংস্কৃতভাষী ছিল না। কোনো কালেই অবিমিশ্র বৈদিক ধর্মবিশ্বাসী ছিল না। কোনো কালেই অবিমিশ্র বর্ণাশ্রম নামক সমাজব্যবস্থার শাসনাধীন ছিল না। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র চার বার এ দেশের কোনো এক নগরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার কাছে অধিকাংশ আঞ্চলিক সরকার নতিস্বীকার করেছে। একবার মৌর্যযুগে, একবার গুপ্তযুগে, একবার মুঘল যুগে, একবার ব্রিটিশ যুগে। চারটি যুগই দুই তিন শতাব্দীতেই শেষ। এদিক থেকে সমগ্র ভারত সমগ্র ইউরোপের সঙ্গেই তুলনীয়। বিবিধের মধ্যে ঐক্যের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্রোত চির প্রবহমান, যেমন ইউরোপে তেমনি ভারতে। ভারত প্রকৃতপক্ষে একটি মহাদেশ। ইউরোপেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কয়েকবার দেখা গেছে। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর রোমান ক্যাথলিক চার্চের আদর্শে হোলি রোমান এম্পায়ার স্থাপন করা হয়, কিন্তু চার্চ নিজেই বিভক্ত হয়ে যায়। সাম্রাজ্যও সেই পথ ধরে। নেপোলিয়নের অভিপ্রায় ছিল রোমকে বা

ভিয়েনাকে কেন্দ্র না করে প্যারিসকে কেন্দ্র করে নতুন এক সাম্রাজ্যের পত্তন। তিনিও ব্যর্থ হন। হিটলারের স্বপ্ন ছিল বার্লিনকে কেন্দ্র করে পুনর্বার সাম্রাজ্য সংস্থাপন। তিনিও বিফল হন। অনেকের আশঙ্কা এবার মস্কোর পালা। সেখান থেকেই দ্বিগ্বিজয় আরম্ভ হয়ে সারা ইউরোপকে লালে লাল করবে। তার জন্যে সামরিক প্রস্তুতি চলেছে প্রত্যেকটি দেশেই। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে।

বিবিধের মধ্যে ঐক্যের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্রোত ইউরোপেও ভারতের মতোই চির প্রবহমান। এটা রাজনীতির জগতে তেমন অর্থবহ নয় যেমন সংস্কৃতির জগতে। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবাই বেঠোভেনের সঙ্গীত আর শেক্সপীয়ারের নাটক ভালোবাসে। সকলেরই প্রিয় ইটালার আর ফ্রান্সের চিত্র ভাস্কর্য। লাটিন যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা ছিল তখন এক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সব দেশের বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়োগ ছিল। ক্লাসের পড়াশুনা সব দেশের ছাত্র মিলে একসঙ্গে করত। কিন্তু থাকা খাওয়ার বেলা পৃথক ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থাকেই বলা হতো কলেজ। কলেজ কথাটির অর্থই ছিল ছাত্রাবাস। ইউরোপের লাটিন-মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইউরোপকে যে সাংস্কৃতিক ঐক্য দেয় তা পরবর্তীকালে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি মাধ্যম প্রবর্তনের ফলে ছিন্নভিন্ন হয়। এখন এক দেশের ছাত্র অপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সচরাচর পড়তে যায় না। এক দেশের অধ্যাপক অপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত স্থায়ী পদ পান না। প্রত্যেকটি ভাষাই চেষ্টা করছে লাটিনের শূন্যতা পূরণ করতে। দর্শনে বিজ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে। কিন্তু পাঠকসংখ্যার উপরই নির্ভর করে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনের লাভক্ষতি। সেদিক থেকে ইংরেজীই সব চেয়ে ভাগ্যবান, তার পরে রাশিয়ান। ফরাসী জার্মানও হটে যাচ্ছে। ইটালিয়ানও পেছিয়ে পড়ছে। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক এক দেশ বা এক এক বিশ্ববিদ্যালয় এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করছে। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানে বা পুরাতত্ত্বে। সব দেশ বা সব বিশ্ববিদ্যালয় সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে পারে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্রও নানা দেশের নানা স্থানে স্থাপিত হয়েছে। ভাষা সাধারণত ইংরেজী বা ফরাসী বা দুই বা স্থানীয় ভাষা মিলে তিন। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে রাশিয়ানদের আকর্ষণ করতে পারা যাচ্ছে না। তাদের আকর্ষণ করতে হলে তাদের ভাষাকেও যথাস্থান দিতে হবে।

এবার ভারতের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীন কাল থেকেই বারাণসী, তক্ষশীলার মতো উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় তা ছিল বলে মনে হয় না। উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বিদ্বান ও বিদ্যার্থীর সমাগম হতো ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ভারতের বাইরে থেকেও। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ পণ্ডিতদেরও অসংখ্য গ্রন্থ ছিল ও চীন জাপানে গেলে এখনো দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে বা ক্ষত্রিয় রাজার রাজসভায় নিবদ্ধ ছিল না। বৌদ্ধ বিহারগুলিতেও সংস্কৃতচর্চা হতো। একজন সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু আমাকে বলেন সিংহলী ভাষার শতকরা আশিটি শব্দই সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ। জৈনদের মধ্যেও সংস্কৃতের চর্চা ছিল উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে। তবে জনসাধারণের

জন্যে বৌদ্ধরা ব্যবহার করতেন পালী ও জৈনরা প্রাকৃত। প্রাকৃত থেকেই কালক্রমে বাংলা, হিন্দী. মরাঠী প্রভৃতি ভাষা বিবর্তিত হয়। সংস্কৃত থেকেই তারা নানা ভাবে প্রেরণা ও সাহায্য পায়। ইউরোপে যেমন ইটালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা বিবর্তিত হয় স্থানীয় লোকভাষা থেকে। যেমন লাটিন থেকে প্রেরণা ও সাহায্য পায়। এই সমান্তরাল বিবর্তনটা মোটের উপর একই ঐতিহাসিক যুগে সাধিত হয়। এখানে বলে রাখি যে তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগুলি আর্যভাষা নয়। তাদের বিবর্তনের ধারা অন্যরূপ। তামিল তো সংস্কৃতের মতোই প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যেন লাটিনের সঙ্গে গ্রীকের। তফাৎ শুধু এই যে গ্রীকও আর্যভাষা। দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষা উত্তরভারত ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করেনি. যদিও তা এখানে ওখানে অনুপ্রবেশ করেছে।

যতদূর জানা যায় আর্যদের পূর্বেও দ্রাবিড়রা ছিল। ছিল উত্তরভারতেও। কিন্তু কোণঠাসা হতে হতে দক্ষিণে ঘাঁটি গাড়ে। এখানে আর্য আর দ্রাবিড় শব্দ দুটো আমি জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করছি। আর্যরা দ্রাবিড়দের সর্বত্র জয় করতে পারেনি। তার আগেই একপ্রকার সন্ধি হয়ে যায় এই মর্মে যে, তুমি তোমার এলাকায় থাকবে. আমি আমার এলাকায় থাকব। এই প্রকার সন্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ণাশ্রমী সমাজ ব্যবস্থা। গোড়ায় সেটা বোধহয় ক্ষত্রিয়প্রধান ছিল, ব্রাহ্মণপ্রধান নয়। যেমন ইউরোপে। পরবর্তী কালে যেমন সেখানে খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীদের প্রাধান্য ঘটে তেমনি এখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের। মৌর্যদের আমলেও এটা ছিল না। এটা খ্রীস্টোত্তর কালের বলেই আমার অনুমান।

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের আরো এক অদৃশ্য মিল, খ্রীষ্টীয় যাজকদের প্রাধান্য উত্তরাংশের রাজারা খর্ব করেন। রাজশক্তি যাজকশক্তিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেয় না। চার্চ দু'ভাগ হয়ে যায়। এদেশে আরব, তুর্ক আর মুঘলরা এসে উত্তরভারতের রাজশক্তি করায়ত্ত করে। রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য লোপ পায়। রাজভাষা সংস্কৃতের জায়গায় ফারসী হয়। সংস্কৃতশিক্ষায় যাদের অধিকার ছিল না তারাও অবাধে ফারসী শিখতে পায়। ফারসী শিখে রাজকর্মে নিযুক্ত হয়। জায়গির ইনাম পায়। রাজা খেতাব পায়। বর্ণের দিক থেকে শূদ্র, শ্রেণীর দিক থেকে জমিদার. রাজকর্মের দিক থেকে দেওয়ান বা ফৌজদার এঁরা রাষ্ট্রের মই বেয়ে উপরে ওঠেন। তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও এঁদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের মতো ব্যবহার করেন। উত্তরাখণ্ডের কায়স্থরা তো ক্ষত্রিয় বলেই স্বীকৃত হন। অসিজীবী নয়, মসীজীবী ক্ষত্রিয়।

ফারসীর সঙ্গেও বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার প্রতিবেশী সম্পর্ক পাতানো হয়। এসব ভাষা ফারসী থেকেও প্রেরণা ও সাহায্য পায়। দিল্লীর আশে পাশে একটি মিশ্র ভাষারও প্রচলন হয়। ফারসী-মিশ্রিত স্থানীয় ভাষার নাম রাখা হয় উর্দু। এ ভাষা বিদেশী ভাষা নয়। এর ব্যাকরণ আর হিন্দীর ব্যাকরণ মোটের উপর অভিন্ন। হিন্দুরাও পুরুষানুক্রমে উর্দুভাষী হয়। শিখরাও। সুতরাং এটা মুসলমানদের একচেটে নয়। উর্দুভাষী হলেই মুসলমান হয় না। তেমনি মুসলমান হলেই উর্দুভাষী হয় না। অনেকেই গুজরাটীভাষী, সিন্ধীভাষী, বাংলাভাষী, তামিলভাষী। হিন্দীভাষী মুসলমানও যে নেই তা নয়।

ঝগড়াটা প্রধানত লিপি নিয়ে। লিপি আলাদা না হলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ভাষা উর্দু, উভয়েরই ভাষা হিন্দী। লিপি নিয়ে ঝগড়া পাঞ্জাবীদের মধ্যেও দেখা যায়। গুরমুখী একটা লিপির নাম। এ লিপিতে যারা লেখে তারা ধর্মে শিখ। কিন্তু তাদের ভাষা পাঞ্জাবী। যারা ধর্মে মুসলমান তারা লেখে ফারসী লিপিতে, কিন্তু তাদের ভাষাও পাঞ্জাবী। যারা ধর্মে হিন্দু তারা লেখে নাগরীতে। কিন্তু তাদের ভাষাও পাঞ্জাবী। তার মানে পাঞ্জাবী সাহিত্যের তিন লিপি। সেইসূত্রে তিন প্রস্থ পাঠক। অতএব তিন প্রস্থ লেখক। তারা আবার দেশভাগ ও প্রদেশভাগের পরে দুই ন্যাশনালিটিতে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এখনো তাদের পুরাতন লোকগাথা তাদের সকলের প্রিয়। লোক-সাহিত্যে ধর্মভেদ, নেশনভেদ নেই। প্রচ্ছন্ন ঐক্য ফল্গুধারার মতো নিত্য প্রবহমান।

ফারসীকেও একদিন ইংরেজীর জন্যে আসন ছেড়ে দিতে হলো। ব্রিটিশ রাজ ইংরেজী শিক্ষিতদের রাজকর্মে নিযুক্ত করলেন। শূদ্ররাও বড়ো বড়ো পদ পেয়ে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ হলো। বড়লাটের শাসনপরিষদের প্রথম ও তৎকালে একমাত্র ভারতীয় সদস্য ও পরবর্তীকালে প্রথম তথা একমাত্র ভারতীয় লর্ড একজন কায়স্থ বংশের সন্তান। এই যে পরিবর্তন এটা কেবল রাষ্ট্রেই নিবদ্ধ রইল না, সমাজেও পরিবর্তন দেখা দিল। বর্ণাশ্রম ভেঙে পড়ল। ফারসী শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা পরোক্ষভাবে অভূতপূর্ব সামাজিক পরিবর্তন সাধন করেছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তাকে রেনেসাঁস বলা ভুল নয়। তবে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের সঙ্গে তা সর্বাঙ্গে মেলে না। সর্বাঙ্গে মিলবেও না। তা দেখে কেউ যদি বলেন যে রেনেসাঁস কোনো কালেই এদেশে হবার নয়, তার প্রয়োজনই নেই তা হলে সেটা হবে মস্ত বড়ো ভুল। রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে এদেশের সাহিত্যকে, দর্শনকে, বিজ্ঞানকে, চিত্রকলাকে, ভাস্কর্যকে, নৃত্যকে, নাট্যকে। কবে শ্রমিক কৃষক সর্বহারা এতে যোগ দেবে বা এর নায়ক হবে তার জন্যে দেশের সারস্বতরা অপেক্ষা করবেন না। শ্রীক্ষেত্রে সকলের প্রবেশাধিকার আছে। সংস্কৃতির শ্রীক্ষেত্রে মধ্যবিত্তদেরও।

ভারতের সংস্কৃতি যেমন ভারতের বাইরে গেছে তেমনি বিদেশের সংস্কৃতিও ভারতের ভিতরে এসেছে। এমনি একটা আদান প্রদান চলে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। মাটির তলায় পাওয়া যাচ্ছে কোথাও মিশরের কোথাও রোমের মুদ্রা বা কারু-কার্য। সমুদ্রপথে বাণিজ্য তো ছিলই, ছিল স্থলপথেও বাণিজ্য। ধর্মপ্রচারের জন্যে বৌদ্ধ শ্রমণরা দেশদেশান্তরে যেতেন, এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে সীরিয়া থেকে খ্রীষ্টীয় সাধুরাও আসতেন। খ্রীস্টান এদেশে আছেন প্রথম শতাব্দী থেকেই। তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না। সীরিয়া বলতে প্যালেস্টাইনকেও বোঝাত। খ্রীস্টধর্ম যেমন পশ্চিমমুখে যেতে যেতে রোমে পৌঁছয় তেমনি পুব মুখে আসতে আসতে দক্ষিণ ভারতে পৌঁছয়। ইসলাম প্রবর্তনের পূর্বেই আরবদের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। আরবদেশীয় বণিকরাই প্রথমে ইসলাম বহন করে আনেন। ভারতীয় মুসলমানদের পূর্বতন পুরুষরা বিজেতা ছিলেন না। বিজয়ের সঙ্গে একপক্ষে গৌরববোধ ও অপরপক্ষে গ্লানিবোধ থাকে। তার থেকে মুক্ত কেরলের মুসলিম জনমানস। তবে মোপলাদের পিতৃকুল আরব বলে তাদের মধ্যে একটা বিদেশী মান-

সিকতা লক্ষ্য করা গেছে। ইসলাম পরবর্তীকালে বিজয়ী আরব, তুর্ক ও মুঘলদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করে। কিন্তু বিজেতারা তাঁদের পিতৃভূমির থেকে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হন। কেউ আর প্রাক্তন মাতৃভাষার কথা বলেন না। এই দেশের নারীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক পাতিয়ে এদেশের বিভিন্ন ভাষাকেই সন্তানকুলের মাতৃভাষা হতে দেন। পরবর্তীকালে যেসব ইউরোপীয় বণিক ও বিজেতা এদেশে আসেন তাঁদেরও একই পরিণতি হতো, যদি না তাঁরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতেন। ভারতের ইতিহাসে এই একটিবারই দেখা গেল যে বিদেশী বণিক ও বিজেতারা স্বদেশে ফিরে গেলেন। আর সবাই এদেশেই বসবাস করে এদেশের মাটিকেই তাঁদের বংশধরদের মাতৃভূমি করেছেন। তা বলে তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় বা সামাজিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেন তা নয়। গ্রীক, শক, কুশান, হূনরা হিন্দু বা বৌদ্ধ ধারায় লীন হয়ে গেছেন, কিন্তু আরব, পারসিক, তুর্ক, মুঘলরা তা হননি। কেউ তাঁদের বাধ্যও করেনি। পরিবর্তনটা হয়েছে ভাষার বেলা, সাহিত্যের বেলা, সঙ্গীতের বেলা, শিল্পের বেলা। এক কথায় সংস্কৃতির বেলা। এক্ষেত্রে হিন্দুও মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েছে, মুসলমানও হিন্দুর কাছ থেকে নিয়েছে। এটা বিশেষ করে লক্ষণীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বেলা। এ রকম তো সব দেশেই ঘটেছে। আমদানী রপ্তানী যেমন বাণিজ্যের নিয়ম আদান প্রদানও তেমনি সংস্কৃতিরও নিয়ম। শুচিবাতিকগ্রস্ত যারা তাঁদের অস্তিত্ব জরাগ্রস্ত হয়। বিলোপও ঘটে। যেমন প্রাচীন মিশরের বা প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ার। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে চির প্রবহমান তার মূল কারণ ভারতের রীতি বাইরে থেকে অবাধে গ্রহণ ও পরে স্বাঙ্গীকরণ।

সংস্কৃতির স্রোত প্রবাহিত হয় অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে। ধারাভঙ্গ ঘটেছে ইউরোপের ইতিহাসে বার বার। ভারতের ইতিহাসে একবার কি দু'বার। মোহেনজো-দরো আর হরপ্পার সঙ্গে যোগসূত্র যে ছিন্ন হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়, কারণ সংস্কৃত সাহিত্যের উপর তার কোথাও কোনো ছাপ পড়েনি। বেদে নাকি একটা শব্দের মিল পাওয়া গেছে। কিন্তু এই শতাব্দীতেই আমরা প্রথম জানতে পেলুম যে সিন্ধু উপত্যকায় এক বিলুপ্ত সভ্যতা ছিল, যার সম্বন্ধে তিন হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অজ্ঞ। এ যেন আটলাণ্টা মহাদেশের পুনরুদ্ধার। সেটা এখনো ঘটেনি। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিল এটা স্বতঃপ্রমাণিত।

দ্বিতীয়বার ধারাভঙ্গ ঘটে যখন হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হয়ে যায়, আরবী নাম ধারণ করে, ইসলামের ইতিহাসকেই করে আপনাদের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাসকে কেবলমাত্র হিন্দুর ইতিহাস মনে করে। ভারতের মোট লোকসংখ্যার চারভাগের একভাগ এই ভাবে ভারতের অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ইসলামী জাহানের অন্তর্গত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হলেও ইসলামী জাহানেই রয়ে গেছে বাংলাদেশের মুসলিম মানস। প্রাচীন বঙ্গের সঙ্গেও সে আর জোড় মেলাতে পারছে না। পাল যুগের ঐতিহ্যও তার কাছে কেবলমাত্র হিন্দুর। এতে বাংলা-দেশের রেনেসাঁস খণ্ডিত হবেই। কারণ রেনেসাঁস অতীতকে বাদ দিয়ে নয়। অতীতের সঙ্গে জোড় মিলিয়ে নিয়ে। যেমন ঘটেছে ইউরোপের ইতিহাসে গ্রীক ও রোমান

চেতনাকে পুনরুদ্ধার করে তাদের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় চেতনার মিলন ঘটিয়ে। সে মিলন এখনো অসম্পূর্ণ। ইতিমধ্যে ইউরোপের কমিউনিস্ট লোকমানসে আরো একবার ধারাভঙ্গ ঘটে গেছে। এই নিয়ে চার বার। মার্কসীয় মানস মার্কসপূর্ব অতীতকে সামাজিক অন্যায়ে জর্জরিত অতীত বলে বর্জন করে। তার মধ্যে যেখানে যেটুকু শ্রেণীযুদ্ধের সহায়ক সেখানে সেইটুকুই তার ঐতিহ্যভুক্ত, আর সব শোষক শ্রেণীর ঐতিহ্য বলে পরিত্যক্ত। ইদানীং কিঞ্চিৎ মতি পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। কারণ কমিউনিস্ট দেশগুলিতে ন্যাশনালিজমও সক্রিয়। রুশ, পোল, পূর্বজার্মান, হাঙ্গেরিয়ান, চীনা, ভিয়েৎনামী, কিউবান, ইথিয়োপীয়ান সবাই কমিউনিস্ট হলেও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র নেশন। তাই স্বকীয় অতীতকে পুরোপুরি বর্জন করতে নারাজ। করলে যে ডালে বসেছে সেই ডাল কাটা হয়। জাতীয় উত্তরাধিকার শ্রমিক কৃষকদেরও অমূল্য ঐশ্বর্য।

ইউরোপীয় শাসকরা এদেশে এসে সাংস্কৃতিক ধারাভঙ্গ ঘটাতে চাননি। ব্রিটিশ শাসনের আশি বছর পর্যন্ত ফারসীই আদালতের ভাষা ছিল। ওঁরা তো সংস্কৃত তথা আরবী ফারসী শিক্ষারই পক্ষপাতী ছিলেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ওঁদের উদ্যোগে নয়। কলকাতার হিন্দু ও বোম্বাইয়ের পার্শীদের উদ্যোগেই হয়। এঁদের লক্ষ্য অতীতের রোমন্থন নয়, আধুনিকতার উদ্বোধন। ইংরেজী শিক্ষাই ভারতীয়দের আধুনিক যুগের মানুষ করতে পারত, সংস্কৃত বা আরবী ফারসী নয়। এদেশের মানুষ ব্যাকুল হয়েছিল আধুনিক যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে। কেবলমাত্র জাতীয় অতীতের সঙ্গে নয়। তবে তার মূল্য সম্বন্ধে বোধও ছিল। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যকে, প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিককে মিলিয়ে নিতে হবে এটাই ভারতীয় মনীষীদের সুচিন্তিত আদর্শ হয়। এটাও ইউ-রোপীয়দের প্রবর্তনায় নয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এঁরা স্বাধীনচেতা পুরুষ। ভারতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্যেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন বাঞ্ছনীয় বোধ হয়েছিল। এর নাম দাস মানসিকতা নয়। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে আদান প্রদানের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দাসসৃষ্টির উদ্যোগ ছিল না। সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়েই জাতীয়তাবাদ অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হয়। পরস্পরকে জানবার ও বোঝবার জন্যে ও ছাড়া আর কোনো মিলনপ্রাঙ্গণ ছিল না। স্বাধীন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীরও একই উদ্দেশ্য। সেটিও একটি মিলনসূত্র।

বাইরের সঙ্গে আদান প্রদান চলে। কিন্তু অতীতের সঙ্গে কেবলমাত্র আদান। পশ্চিমের সঙ্গে লোকসানের কারবার হলেও সেটা একটা কারবার। তাতে বিনিময়ের সুযোগ আছে। কিন্তু অতীতের কাছ থেকে আমরা কেবল নিতেই পারি, তাকে কিছু দিতে পারিনে। তার ভাণ্ডারও একদিন নিঃশেষিত হতে পারে, যেমন কয়লার বা পেট্রোলিয়মের খনি। অতীত থেকে আমদানী করতে করতে সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমে অতীতেরই প্রতিধ্বনিতে পর্যবসিত হয়। তার নতুন কিছু নেবারও থাকে না, দেবারও থাকে না। একই অবস্থা হয়েছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেরও। একই বিষয় নিয়ে শত শত রচনা। পুনরাবৃত্তি। রোমন্থন। তোমার অতীত যতই মহিমাময় হোক না কেন তুমি তো সে মহিমার সঙ্গে মহিমা যোগ করতে পারছ না। কেবলি সঞ্চয় ভাঙিয়ে খাচ্ছ।

এমনি এক সন্ধিক্ষণে বাইরে থেকে আসে আরবী ফারসী সাহিত্য ও তার মারফৎ প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা। হিন্দুরাও এসব চর্চা করে, ফারসী লেখকদের মধ্যে বাঙালী হিন্দুও ছিলেন, উর্দু লেখকদের মধ্যে বিস্তর হিন্দু ও শিখ। রামমোহনের প্রথম বইখানা আরবীতে বা ফারসীতে লেখা। তিনি তো একটা ফারসী পত্রিকাও চালাতেন। সংস্কৃতের বেলায় যেমন পুনরাবৃত্তি ও রোমন্থন আরবী ফারসীর বেলায়ও তাই ঘটে। একই বিষয়ে শত শত গ্রন্থ। যে দুই দেশ থেকে আদান সেই দুই দেশেও চর্বিত চর্বণ চলছিল। তারাও অতীতসর্বস্ব। অনুরূপ এক সন্ধিক্ষণে ইংরেজী সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আবির্ভাব। গোড়ার দিকে শুধুমাত্র আদান, শেষের দিকে আদানের বিনিময়ে প্রদান। ইংরেজী সাহিত্যে বাঙালী প্রভৃতিরও কিঞ্চিৎ দান আছে। ইংরেজী কাব্যের সংকলনে তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও দেখা যায়। সেই সূত্রে এঁরাও সম্মানের আসন লাভ করেছেন। অরবিন্দের 'সাবিত্রী'ও একটি মহৎ দান।

বাইরের সঙ্গে আদান প্রদান অফুরন্ত, কিন্তু অতীতের থেকে আদান ফুরন্ত। তাই রামায়ণ মহাভারত বা বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বন করে আর কোনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। মেঘদূতের অনুবাদ কে না করছেন, কিন্তু আর একখানা মেঘদূত কোথায়? অতীতের থেকে নতুন কোনো প্রেরণা মিলবে না, মিলতে পারে জনজীবনের থেকে। লোকসংস্কৃতি এমন এক ভাণ্ডার যা এখনো নিঃশেষিত হয়নি, কখনো নিঃশেষিত হবে না। গানে গাথায় কাহিনীতে কিংবদন্তীতে ছড়ায় ধাঁধায় প্রবাদে বচনে যাত্রায় সং তামাশায় লোকসংস্কৃতির নিত্য প্রবহমান ধারা ভারতের তথা বাংলাদেশের তথা পাকিস্তানের একটি মহামূল্য ঐশ্বর্য। এই খনি থেকে মণি তুলে আনলে বিদগ্ধ মহলের উচ্চস্তরের সংস্কৃতিও নতুন প্রাণ পেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে লোকসংস্কৃতির দিকে সারস্বত মণ্ডলীর দৃষ্টি যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের দিকে নজর দেন। বাউলগীতিকে যদি লোকসংস্কৃতির পর্যায়ে ফেলি তবে বাউলগীতির প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অভূতপূর্ব গভীরতা ও সিদ্ধি দিয়েছে। কিন্তু লোকগীতির নামে যা চলছে তার বেশীর ভাগই তো জাল বা ভেজাল। এর জন্যে যে সাধনার প্রয়োজন তা শহরে বসে শহুরে লোকের মনোরঞ্জনের তাগিদে হয় না। পল্লীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হলে লোকসংস্কৃতির সঙ্গেও জোড় মেলানো যাবে না।

সংস্কৃতির ইতিহাসে এটিও একটি সন্ধিক্ষণ। সাধারণের মনোরঞ্জন আর সাহিত্যের মাধ্যমে বিপ্লব প্রচার এই দুটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম নিয়ে যদি আমরা ব্যাপৃত থাকি তবে আমরা সংস্কৃতির রূপান্তর বা বিকাশ সাধন করতে পারব না। বহুপ্রসবিনী হয়েও আমাদের লেখনী বন্ধ্যা হবে। অন্যান্য দেশেও লক্ষ্য করছি যে শিল্পায়িত নাগরিক সভ্যতা সংস্কৃতির বিস্তারে সফল হলেও তার সৃষ্টির বেলা বহুপ্রসবিনী হয়েও বন্ধ্যা। যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। সোনার জন্যে চাই অন্তহীন অন্বেষণ, অন্তরতম অনুভূতি, প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য। ফর্ম, টেকনিক ইত্যাদি তার পরের কথা। তারও মূল্য আছে যদিও।

এমন দেশ নেই যেদেশে লোকসংস্কৃতি নেই। কিন্তু সে দেশের সংস্কৃতি বলতে কেবল সে দেশের লোকসংস্কৃতি বোঝায় না। তার চেয়ে উচ্চতর স্তরের সংস্কৃতিও বোঝায়। শিক্ষিত মহলে কেবল উচ্চতর সংস্কৃতিই বোঝায়। সেদিক থেকে বিচার করলে সে দেশের লোকসংস্কৃতি যদিও আর সব দেশের সঙ্গে তুলনায় সমান তার উচ্চতর সংস্কৃতি কিন্তু তুলনায় অনুচ্চ। ওসব বিশেষণ বাদ দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় সে দেশের সংস্কৃতি অন্যের তুলনায় অনগ্রসর বা পশ্চাৎপদ বা অবিবর্তিত বা অল্পবিবর্তিত। এমনও হতে পারে যে তুলনাই চলে না, সে দেশের সংস্কৃতি অনন্য। তাই যদি হয় তবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন বা ইউনিভার্সাল বলে কিছু নেই। সংস্কৃতি একান্তভাবেই স্বাদেশিক। শুধু ব্রিটেনের জন্যে শেক্‌সপীয়ার, শুধু জার্মানীর জন্যে বেঠোভেন, শুধু রাশিয়ার জন্যে টলস্টয়, শুধু ইটালীর জন্যে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি। আর শুধু ভারতের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ।

এ রকম একটা ধারণা কবিগুরুর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পূর্বে আমাদের স্বদেশ-প্রেমিকদের অনেকের ছিল। তাঁদের বক্তব্য ভারত একাই একটি জগৎ। যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে। কারো কাছ থেকে কিছু নেবারও নেই, কাউকে কিছু দেবারও নেই। ভারতের সংস্কৃতি কখনো কারো কাছ থেকে কিছু নেয়নি, কাউকে কিছু দেয়নি। যদি দিয়ে থাকে তবে ভারতই দিয়েছে। যদি দেবার থাকে ভারতই দেবে। ভারতের ভূগোল, ভারতের ইতিহাস, ভারতের অর্থনীতি, ভারতের রাজনীতি, ভারতের সমাজ, ভারতের ধর্ম, ভারতের নীতি, ভারতের রীতি সমস্তই তার নিজস্ব। বিবর্তন তত্ত্ব যদি মানতে হয় তবে ভারতের বিবর্তনও তার স্বকীয় ধারায়। পরকীয়া প্রেম যেমন বর্জনীয় পরকীয়া সংস্কৃতিও তেমনি বর্জনীয়।

একই মনোভাব চীনদেশের স্বদেশপ্রেমিকদেরও। জাপানের স্বদেশপ্রেমিকদেরও। যাঁরা চীন, জাপান ও ভারতের মিতালিতে বিশ্বাসী তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৌল বিভেদেও বিশ্বাসী। প্রাচী হচ্ছে প্রাচী, প্রতীচী হচ্ছে প্রতীচী। সে দুইয়ের মিলন কদাচ হবার নয়। অবিকল কিপলিং-এর সিদ্ধান্ত। ভারত, চীন ও জাপানকে একসূত্রে বেঁধেছিল বৌদ্ধ ধর্ম। কাকুজো ওকাকুরা বৌদ্ধ ছিলেন। অনেকে তাঁকে কাউন্ট বলে ভুল করেন। না, তিনি কাউন্ট ছিলেন না। ওকুমা ছিলেন কাউন্ট। উদোর উপাধি বুধোর ঘাড়ে চেপেছে। ওকাকুরার রাজদত্ত কোনো উপাধি ছিল না, কিন্তু লোকদত্ত একটি উপাধি ছিল। তাঁকে বলা হতো তেনশিন ওকাকুরা। তার মানে বোধহয় শিল্পাচার্য। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য প্রথায় ছবি আঁকার, ঘর সাজানোর, বাস্তু গড়ার

ঘোর বিরোধী। জাপান যে পশ্চিমের অনুকরণে পাশ্চাত্য পথে চলেছে এতে তিনি দারুণ অশান্তি বোধ করতেন। সেই অশান্তিই তাঁর কাল হলো। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে লিখিত পত্রাবলী চল্লিশ বছর বাদে আমার হাতে আসে। একজন হতাশ স্বদেশ-প্রেমিকের কাতরোক্তি। জাপান বিপথগামী হয়েছে। তার স্বধর্মকে হারিয়েছে। অতএব জীবন ব্যর্থ। জাপানে গিয়ে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁদের মধ্যে তাঁরই মতো হতাশ স্বদেশপ্রেমিক কবি ও চিন্তাশীলদেরও দেখি।

চীন, জাপান ও ভারতের যোগসূত্র যেমন বৌদ্ধ ধর্ম তেমনি আরব, ইরান ও ভারতের যোগসূত্র ইসলাম ধর্ম। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক থাকায় এই তিন দেশের সংস্কৃতিতেও যথেষ্ট যোগাযোগ ঘটেছে। তার সাক্ষ্য দিচ্ছে তাজমহল, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, উর্দু ভাষা। হিন্দুরাও তাজমহল দেখে অভিভূত হয়, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়, উর্দু ভাষাকেই মাতৃভাষা মনে করে। মোগলাই খানা তাদের কারো কারো প্রিয়। কারো কারো বাড়ীতে দুপুরের খাবার রাঁধে বামুন ঠাকুর, রাতের খানা পাকায় মুসলমান বাবুর্চি। এটা সেই নবাবী আমলের জের। এঁদের পরিধানও মোগলাই। এইভাবে একটা আরব, পারসিক, ভারতীয় মিতালীও গড়ে উঠেছিল। হিন্দু ও শিখ রাজাদেরও দরবারী ভাষা ছিল পারসিক। সাজপোশাকও পারসিক। রাজারা দশহরার দিন যুদ্ধ-যাত্রায় যেতেন হাতীর পিঠে চড়ে। মাহুতরা মুসলমান। আসামের শিবসাগরের দেব-মন্দিরে দেবাদিদেবের ঘুম ভাঙাতে হয় নহবৎ বাজিয়ে। বাজায় যারা তারা মুসলমান। সানাই না হলে হিন্দুর বিয়ে হয় না। বাজায় মুসলমানরাই। রাজস্থানের রাজ অন্তঃপুরে রানী মহারানীদের শাসন করে যারা তারা মুসলমান খোজা। প্রাচীন ভারতের কঞ্চুকীরা কোথায় গেলেন কে জানে! নবজাত শিশুদের কল্যাণের জন্যে হিজড়ারা গিয়ে গান গায়, নাচে। ওরাও নাকি মুসলমান। বাদশাদের মতো রাজাদের গৃহস্থালীর ভার নিতেন যাঁরা তাঁদের বলা হতো খান-ই সামান। অর্থাৎ চেম্বারলেন। আমার যে রাজ্যে জন্ম সে রাজ্যের রাজবাড়ীর খান-ই সামান ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। লোকমুখে খান-ই সামান বনে যায় খানসামা। আমার নিজের খানসামা ছিল মুসলমান। ততদিনে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটেছে। যে খানা পরিবেশন করে। প্রয়োজন হলে খানা বানায়।

ইসলাম যাদের ধর্ম নয় পারসিক সংস্কৃতি তাদেরও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেছে। "না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল। তেঁই রচিলাম ভাষা যাবনীমিশাল।" এই হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রের কৈফিয়ৎ। কেবল ভাষা নয়, সাহিত্যও ছিল যাবনী-মিশাল, নইলে রসাল হতো না। মুসলমান সুলতানদের আনুকূল্য না পেলে এর বিকাশ হতো না। এর বিবর্তনে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই অংশ আছে। এখন তো বেশীর ভাগ বাঙালীই মুসলমান। দেশভাগের পর বেশীর ভাগ বাঙালীর রাষ্ট্রভাষা হয়েছে বাংলা। ধর্মে মুসলমান, সংস্কৃতিতে বাঙালী—এ যেন ধর্মে মুসলমান, সংস্কৃতিতে ইন্দোনেশীয়। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধও নেই, অভিন্নতাও নেই। ধর্ম আর সংস্কৃতি একাকার নয়। সেই ভুলটা করছে পাকিস্তান। করতে গিয়ে হিন্দু ও শিখদের একধার

থেকে তাড়িয়েছে বা পালাতে বাধ্য করেছে। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে উর্দু গিয়ে জুড়ে বসেছে সরকারী দফ্তর। উর্দু কোনোকালেই ইসলামের ভাষা ছিল না। ইসলামের ভাষা আরবী। নামটা বাদ দিলে, লিপিটা বাদ দিলে উর্দু ভারতের দেশজ ভাষা। হিন্দীরই জাতভাই বা জাতবোন। শব্দভাণ্ডার যাবনীমিশাল, কিন্তু ব্যাকরণ একই। এদিকে হিন্দীও যে যাবনীমিশাল নয়, তাই বা কেমন করে বলি ? 'হিন্দী' এই নামটাও 'হিন্দু'র মতোই বাইরে থেকে আমদানী। যদিও উভয়েরই মূলে 'হিন্দ্' অর্থাৎ 'সিন্ধ্' তথা 'সিন্ধু'। ওই একই মূল থেকে এসেছে 'ইণ্ড্' তথা 'ইণ্ডিয়া'। সেটাও বাইরে থেকে আমদানী। গ্রীস দেশের যবনরা বলত 'ইণ্ডোস্' বা 'ইণ্ডস্' আর আরব ইরানী যবনরা বলত 'হিন্দ্'। এর মধ্যে ধর্ম কোথায় ? এ বিশুদ্ধ ভূগোল। 'ইংরেজ' বললে কি খ্রীস্টান বোঝায় ? 'ফরাসী' বললে কি খ্রীস্টান বোঝায় ?

ইসলামের প্রবর্তনের পূর্বেও আরব, ইরানী ও গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের লোকের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল, সন্ধিবিগ্রহ ছিল, বিভিন্ন উপলক্ষে যাতায়াত ছিল। হয়তো বিয়ে সাদীও ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এক রানী নাকি ছিলেন গ্রীক রাজকন্যা। যে অসুরদের কাহিনী আমরা পুরাণে পড়ি তারা যদি তৎকালীন আসীরিয়ান হয়ে থাকে তবে তো বিবাহাদির নজীর অতি পুরাতন। আসুরিক বিবাহ কি শাস্ত্রসম্মত ছিল না ? ইরানের ভাষাও ছিল আর্যভাষা। যেমন গ্রীসের ভাষা ছিল আর্যভাষা। আর্যাবর্তের সঙ্গে ভাষাগত মিলও ছিল। তাই মিলন মিশ্রণ অব্যাহত ছিল। পুরাণচর্চা যাঁরা করেন তাঁদের মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন ভারত ব্রিটিশ ভারত নয়। তার সীমানা বহুদূর ব্যাপ্ত। পুরাণে যেসব রাজারাজড়াদের উপাখ্যান আছে তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভারতের ভৌগোলিক চতুঃসীমার বাইরে রাজত্ব করতেন। আর বণিকরা যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতেন আসতেন তা তো প্রাচীনের চেয়েও প্রাচীনতর ধারাবাহিক। সব দেশের মানুষই অন্নের সন্ধানে, বস্ত্রের সন্ধানে, অর্থের সন্ধানে, ধর্মের সন্ধানে, কামের সন্ধানে, মোক্ষের সন্ধানে দেশান্তরে যেত। দেশান্তর থেকে আসত। দিগ্বিজয়ের কথাই ফলাও করে লেখা হয়। কিন্তু সেটাই একমাত্র সত্য নয়। ইতিহাস লেখার পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। একালের ইতিহাস লেখকরা ক্রয়বিক্রয়ের কথাও খুঁটিয়ে লিখছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করছি চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যেমন আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তেমনি আরব, পারসিক, গ্রীকদের সঙ্গেও। গ্রীক বলতে যদি প্রতীচ্য বুঝি তবে প্রতীচ্যের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল। যেমন চীন, জাপান বা প্রাচ্যের সঙ্গে। ভারত ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝখানে অবস্থিত এক মধ্যমণি। পরবর্তীকালে সে একান্তরূপেই প্রাচ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু চীন বা জাপানের মতো প্রাচ্য কখনোই নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এ ভুলটা ধরা পড়ে। সার উইলিয়াম জোন্স প্রমুখ পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেন যে সংস্কৃত আর পারসিক আর গ্রীক আর লাটিন হচ্ছে একই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা। এই ভাষাগোষ্ঠীর নামকরণ হয় আর্য বা এরিয়ান। একই শব্দের রূপান্তর ইরানিয়ান ও এইরিয়ান, যেটা ইংরেজদের মুখে আইরিশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতরা একটা ভুল শোধরাতে গিয়ে কিন্তু আরেকটা

ভুল করেন। ভাষাগোষ্ঠীকে তাঁরা ঠাওরান জাতিগোষ্ঠী। সংস্কৃতিকে ধর্ম আর ধর্মকে সংস্কৃতি বলে যে ভুলটা আমরা এখনো করছি সেই ভুলটাই তাঁরা করেন ভাষাকে জাতি ও জাতিকে ভাষা বলে। ভাষা থেকে জাতি বা রেস্ বোঝা যায় না। ভাষা এক হতে পারে, রেস্ অনেক হতে পারে। আবার রেস্ এক হতে পারে, ভাষা অনেক হতে পারে। ভাষার সঙ্গে রেস্‌কে অভিন্ন মনে করে জার্মানীর নাৎসীরা আর্য মহিমায় আত্মহারা হয়। দেড় হাজার বছর ধরে জার্মানীতে বসবাস করে যারা জার্মান হয়ে গেছে সেই ইহুদীদের তারা সমূলে উচ্ছেদ বা বিনাশ করে। যেহেতু তারা আর্য নয়। পার্সীরাও তো ভারতে দেড় হাজার বছর ধরে বসবাস করে আসছে। তাদেরকেও কি সমূলে উচ্ছেদ বা বিনাশ করা হবে, যেহেতু তারা প্রাচীন ভারতীয় আর্য বংশধর নয়? পার্সীরাও গুজরাতীভাষী। যেমন জার্মানীর ইহুদীরা জার্মানভাষী। সারা ইতিহাস জুড়ে মানবসমষ্টির মাইগ্রেশন চলে আসছে। পাখীদের মাইগ্রেশনের মতো মানুষদেরও মাইগ্রেশন। তরুলতারও মাইগ্রেশন। ফল ফুলেরও মাইগ্রেশন। যেটাকে আমরা স্বদেশী ভাবছি সেটাও বিদেশী। তামাক, আনারস, পেঁপে, গ্যাঁদা, রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা এরাও বিদেশী। এসব খুব পুরোনো নয় বলেই আমরা এদের উৎপত্তিস্থলের খবর রাখি। কিন্তু জাতিকুলের বেলা আমরা অন্ধকারে হাতড়ে চলেছি। ভাষাকে মনে করছি জাতি। সংস্কারকে মনে করছি ধর্ম। আজকের দিনের পণ্ডিতরা স্বীকার করেন না যে আর্যভাষা যাদের ভাষা তারা সেই সুবাদে আর্য জাতি। প্রাচীন সাহিত্যে আর্য কথাটি ছিল সম্ভ্রমসূচক। জাতিবাচক নয়। ধর্মবাচক নয়। সংস্কৃতিবাচক নয়। তবে আর্য ভাষাগোষ্ঠীকে অন্য কোনো শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। উর্দুও আর্যভাষা। অথচ আরবী হচ্ছে সেমিটিক।

আর্যভাষীরা বাইরে থেকেই ভিতরে আসুক আর ভিতর থেকেই বাইরে যাক তারাই ভারতের একমাত্র ভাষাগোষ্ঠী ছিল না। জাতি বলে গণনা করলেও একমাত্র জাতি ছিল না। অসংখ্য জাতি ও ভাষার সহাবস্থান যে দেশে সে দেশকে কেবল আর্যদের বা সংস্কৃতভাষীদের বলে দাবী করা অন্যায়। তবে তাদেরই প্রাধান্য ছিল, সেই প্রাধান্য তারা ইসলামধর্মী আরব, তুর্ক ও মোগল বিজয়ের পূর্ব অবধি বজায় রেখেছিল।

ইউরোপীয়দের মতো এই সব আগন্তুকরাও ছিল তিনভাগে বিভক্ত। শাসক, বণিক ও ধর্মপ্রচারক। বলা যেতে পারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ। শূদ্র ওরা সঙ্গে করে আনেনি, এই দেশেই ধর্মান্তর সহযোগে সংগ্রহ করে। দেশজ মুসলমানকে বলা হয় আতরপ। আর বহিরাগত মুসলমানদের বলা হয় আশরফ। আশরফরাই মুসলিম সমাজে তথা সুলতানী বা বাদশাহী রাষ্ট্রে প্রাধান্য লাভ করেন। কতক হিন্দুকেও তাঁরা তাঁদের শরিক করে নেন। এঁরা একালের ইংরেজীনবিশদের মতো সেকালের ফারসীনবিশ। এঁদের বংশধররা এখনো খান্, চৌধুরী, সরকার, মজুমদার, ফৌজদার, হালদার প্রভৃতি উপাধিধারী। কিছুদিন আগেও এঁরা জমিদার ছিলেন, এখনো জোতদার। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় বণিকরা এসে হাজির হন। বণিকদের পরে আসেন শাসকরা। শাসকদের পরে ধর্মপ্রচারকরা। শূদ্রদের অভাব এঁরা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষাদানের দ্বারা পূরণ করেন।

প্রাধান্য চলে যায় বিদেশী খ্রীস্টানদের হাতে। দেশীয় খ্রীস্টানরা অবহেলিত হন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একই চক্র বার বার ঘুরে আসছে। চাকার উপরে শাসক, বণিক ও ধর্মগুরু। চাকার নিচে শাসিত ও শোষিত জনগণ। ইংরেজ আমলে ফারসীচর্চার পরিবর্তে ইংরেজীচর্চা করে ভারতীয়রা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, অ্যাটর্নি, ডাক্তার, প্রোফেসর হন। এঁদের অনেকে বিলেত ফেরৎ। ক্রমে ক্রমে এঁরাও ইউরোপীয়দের শরিক হন। অবশেষে ইংরেজরা এইসব ইংরেজীনবিশদের হাতেই প্রশাসন সঁপে দিয়ে বিদায় হন। ইতিমধ্যে পলিটিসিয়ান বলে একটি নতুন গোষ্ঠীর উদ্‌ভব হয়েছিল। এঁরাই নির্বাচনসূত্রে আইনসভার সদস্য হয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী অলঙ্কৃত করেন। চাকার উপরে এঁদেরই অধিষ্ঠান।

মুসলমান আগমনের পর থেকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমন্বয় না হোক একটা সামঞ্জস্যের প্রয়াস চলেছিল। সে প্রয়াস বহুপরিমাণে সফলও হয়েছিল। ইউরোপের ক্যাথলিক প্রোটেস্টান্টদের মতো ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তেমন কোনো মারাত্মক সংঘর্ষ ব্যাপকভাবে ঘটেনি। যখন দুটি পক্ষ ছিল তখন দুই পক্ষের মধ্যে সমস্তক্ষণ একপ্রকার 'ডায়ালগ' অব্যাহত ছিল। কিন্তু যেই তৃতীয় পক্ষ এসে জুটল অমনি তাতে ছেদ পড়ে গেল। মনে করুন একটি ঘরে দুটিমাত্র মানুষ ছিল। তারা গোড়ার দিকে ছিল শত্রু। কিন্তু পরস্পরকে কাছে পেয়ে মেলামেশা করে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে মিত্র। এমন সময় তৃতীয় একজন এসে একবার এর কানে কী কথা বলে, আরেকবার ওর কানে কী কথা। এর ফলে দুই মিত্রের মধ্যে আড়াআড়ি। তেমনি ইংরেজরা এসে তাদের ভেদনীতির দ্বারা হিন্দু মুসলমানের মিত্রভেদ ঘটায়। হিন্দুরা ইংরেজী শিখে ও মুসলমানরা ইংরেজী না শিখে সে ভেদকে আরো গভীর করে। হিন্দুরা বড়ো বড়ো পদ পেয়ে ও মুসলমানরা না পেয়ে সে ভেদকে অলঙ্ঘ্য করে। রাজনীতিক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর দ্বন্দ্ব এসে সে ভেদকে দ্বিখণ্ডীকরণে পর্যবসিত করে। সমন্বয়ের আর কথাই ওঠে না। সামঞ্জস্যও বহুদূর। ছিন্ন 'ডায়ালগ' জোড়া লাগেনি। লাগতে পারে কালক্রমে। কিন্তু সে যে কতকাল তা কে বলতে পারে! তবে ভালো যেটা হয়েছে সেটা এই যে ইংরেজরা আমাদের আধুনিক যুগে উপনীত করে দিয়ে গেছে। আধ্যাত্মিকতা কখনো আধুনিকতার বিকল্প হতে পারত না। নিছক আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সংস্কৃতির ভাণ্ডার ভরে না। অবশ্য নিছক আধুনিকতা দিয়েও না। দুই মিলেই পরিপূর্ণতা।

মধ্যযুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল যে ধর্মই জীবনের সারবস্তু। ধর্মহীন জীবন অসার। এই বিশ্বাসের সুফল আমরা দেশে দেশে নিরীক্ষণ করছি মন্দিরে মসজিদে ক্যাথিড্রালে। এল্লোরা অজন্তার শৈলভাস্কর্যে বা গুহাচিত্রে। ধর্মের প্রেরণা সংস্কৃতিকে অমরত্ব দিয়েছে। অমৃত দিয়েছে। কিন্তু এর একটা উল্টো পিঠও আছে। চাঁদের উল্টো পিঠের মতো সেটাও কুৎসিত। গ্রীক রোমানদের দর্শন বিজ্ঞান খ্রীষ্টীয় চার্চের অঙ্কুশের তাড়নায় প্রায় বিলুপ্ত হয়। তাদের দেবদেবীর মন্দির বিধ্বস্ত হয়। তাদের তৈরি দেবদেবীর বা মানুষের মূর্তি বনে জঙ্গলে বা নির্জন দ্বীপে অর্ধভগ্ন অবস্থায় কোনো রকমে টিকে থাকে। খ্রীস্টান

ধর্মগুরুদের নিয়ন্ত্রণ সুদূরপ্রসারী হলেও গীতবাদ্য বা নৃত্য একেবারে নিষিদ্ধ হয় না। অন্তত লোকসংস্কৃতির আড়ালে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু মুসলিম ধর্মগুরুদের বিচারে ওসব সর্বতোভাবে বর্জনীয়। সেইসঙ্গে চিত্রাবলী তথা ভাস্কর্য। ললিতকলার পরিধি এমনি করে অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়। খ্রীস্টানদের তবু একটা গতি ছিল। তাঁরা যীশু খ্রীস্টের বা তাঁর জননী মেরীর ছবি আঁকতে বা মূর্তি গড়তে পারতেন, যতদিন না পিউরিটানদের প্রভাব ও প্রতাপ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মুসলমানদের সেটুকু স্বাধীনতাও ছিল না। তাঁদের ধর্মগুরুরা গোড়া থেকেই গোঁড়া পিউরিটান। অপরপক্ষে ইসলাম প্রবর্তনের পর প্রথম কয়েক শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে যেমন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ছিল খ্রীস্টানদের মধ্যে তেমন নয়। গ্রীক দর্শন, গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান, গ্রীক আয়ুর্বেদকে আরবদেশের মুসলমানরাই যত্ন করে সংরক্ষণ করেন ও ইউরোপের পশ্চিম-প্রান্তে পৌঁছে দেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেও পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের পূর্বাভাষ দেখা দেয় আরব পণ্ডিতদের কল্যাণেই। পরিতাপের বিষয় প্রথম তিন শতাব্দীর সেই অপূর্ব উদারতা ধর্মান্ধদের অঙ্কুশপ্রয়োগে নির্মূল হয়। যাহা নাই কোরানে তাহা নাই দর্শনে, তাহা নাই বিজ্ঞানে। একই কথা ধর্মান্ধ খ্রীস্টানদের মুখেও। যাহা নাই বাইবেলে তাহা নাই দর্শনে, তাহা নাই বিজ্ঞানে। সাহিত্যকেও যে মোল্লারা বা পাদ্রীরা ছাড় দিলেন তা নয়। রাজারা উদার না হলে, অভিজাতরা সুরসিক না হলে সাহিত্যেরও প্রাণসংশয় হতো। রেনেসাঁস এসে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। ধর্মের মুষ্টি শিথিল হয়। তাও একদিনে নয়, বিনা দ্বন্দ্বে নয়। শতখানেক বছর পরে পাদ্রীরা পাল্টা আন্দোলন পরিচালনা করেন। সেটার নাম কাউন্টার-রেনেসাঁস।

ইসলামী দেশগুলিতে রেনেসাঁসের সূচনা সবে শুরু হচ্ছে। কিন্তু নির্বিবাদে নয়। কাউন্টার-রেনেসাঁস সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয়। কোরানকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়ে তার একটা যুক্তিবাদী ভাষ্য রচনা করলে যা হয় তা রেনেসাঁস নয়। স্বাধীনতা সেখানে গণ্ডীবদ্ধ। সীমাহীন স্বাধীনতা না থাকলে রেনেসাঁস হয় না। এটা যে শুধু কোরানের বেলা তা নয়, যে-কোনো শাস্ত্রের বেলা। এমন কি, মার্কস লিখিত সুসমাচারের বেলাও। ইউরোপের চিন্তাশীলরা এখন দোটানায় পড়েছেন। ধর্মের স্থান নিতে চাইছে সমাজতন্ত্র নামক মতবাদ। দেশকে দেশ সমাজতন্ত্রী বনে যাচ্ছে। তা হলে কি সমাজতন্ত্রের প্রতিষেধক হিসাবে ধর্মকে আবার শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে? কোথাও ক্যাথলিক ধর্মকে, কোথাও ইসলাম ধর্মকে? নইলে সব লাল হয়ে যাবে? পাটনায় এক মার্কিন ক্যাথলিক পাদ্রী আমাকে বলেন, "লিবারলরাই নষ্টের গোড়া। লিবারলিজমের পরের ধাপ কমিউনিজম। ধর্মবিশ্বাস একবার যদি টলে তবে তার ঠাঁই নেয় কমিউনিজমে বিশ্বাস।" ইনি ছিলেন ম্যাকার্থির অন্ধ সমর্থক। এ মনোভাব এখন ইরানে, আফগানিস্থানে, পাকিস্তানে কাজ করছে। চিলিতে, আর্জেন্টিনায়, এল সালভাডোরেও। ধর্মকে হটাতে গেলে কমিউনিজম। না হটালে রেনেসাঁস বিরোধিতা।

রেনেসাঁসের আদিপর্বের প্রধান পুরুষরা কারো চেয়ে কম খ্রীস্টান ছিলেন না, ধর্মের সঙ্গে শিল্পকে ও বিজ্ঞানকে মিলিয়ে নিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু শিল্প ও বিজ্ঞানের গ্রীক

ও রোমান আদর্শ তথা ঐতিহ্য ছিল খ্রীস্টপূর্ব। যা কিছু খ্রীস্টপূর্ব তাই খ্রীষ্টীয় বিচারে মূল্যহীন ও হেয়। অপর পক্ষে, যা কিছু মানবিক বা হিউমান তাই রেনেসাঁস নায়কদের বিচারে মূল্যবান ও শ্রেয়। বিবাদটা খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে হিউমানিজমের। যীশুর আবির্ভাবের পূর্বে হোমার, ভার্জিল, সোফোক্লিস, সোক্রেটিস, প্লেটো জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষকে পরিপূর্ণরূপে জানতে হলে তাঁদের কাছে পাঠ নিতে হয়। তাঁদের বাদ দিয়ে কি বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে? তেমনি সেকালের শিল্পকীর্তির রসাস্বাদন না করে কি চিত্রশালা বা ভাস্কর্যশালা চলতে পারে? জীবনের বিচিত্র প্রতিষ্ঠান কি তবে অচলায়তন হবে? সচল হবে কেবল খ্রীষ্টীয় চার্চ। চার্চ যতই দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের ধরে ধরে পুড়িয়ে মারে ততই তাঁদের পক্ষে সমর্থকসংখ্যা বাড়ে। ফরাসী বিপ্লব কেবল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, চার্চের বিরুদ্ধেও বিস্ফোরণ। চোট পড়ে ধর্মের উপরেও। বিপ্লবীরা সেকুলার সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন। রাষ্ট্রব্যবস্থারও। সেই স্বপ্নের কিয়দংশ ইউরোপে, আমেরিকায় ও স্বাধীন ভারতে রূপায়িত হয়েছে। পরাজিত জাপানেও। ধর্মকে জীবনের কতক বিভাগ থেকে হটানো হয়েছে, কতক বিভাগ থেকে হটানো হয়নি। উচিত মনে হয়নি। ধর্ম যদি সর্বগ্রাসী না হয় তবে ধর্মও বাঁচবে, সংস্কৃতিও বাঁচবে, রাজনীতিও বাঁচবে, অর্থনীতিও বাঁচবে। নয়তো মোল্লাদের কবলে পড়বে ইরান, পাকিস্তান প্রভৃতি ইসলামী দেশ, গোঁড়া ক্যাথলিকদের খপ্পরে আরো কয়েকটি দেশ। দেশবাসীর চূড়ান্ত ক্ষতি করার পর এইসব ফাণ্ডামেনটালিস্টরাও পরাস্ত হবেন।

এখন ভারতের কথায় ফিরে আসি। ইংরেজ শাসকরা যখন এদেশের ভার নেন তখন প্রধান কাজ ছিল খাজনা আদায় করা, আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বাণিজ্যের দরজা খুলে দেওয়া। অবাধ বাণিজ্য তখনকার দিনে ব্রিটেনের স্বার্থের অনুকূল। ভারতের স্বার্থের প্রতিকূল। শিক্ষার হেরফের, সংস্কৃতির রূপান্তর, ধর্মের সংস্কার প্রভৃতির জন্যে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল না। খ্রীস্টান হলেও তাঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেণ্ট সঙ্গে করে আনেন। খ্রীস্টধর্মকে প্রশ্রয় দেন না। বরং খোলা মনের হিন্দু দেখলে বা মুসলমান দেখলে তাঁর সঙ্গেই ভাববিনিময় করেন। এটা সরকারী জীবনের আড়ালে। এমনি করেই রামমোহন রায় ইউরোপের অগ্রগতির সংবাদ পান ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার কাজে অগ্রণী হন। তাঁরই মতো আরো অনেকের মাথাব্যথা কী করে পশ্চিমের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া যায়। সেটা কখনো এক লম্ফে হবার নয়। কিন্তু একাধিক লম্ফে হতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অগ্রণীরা একের পর এক লম্ফ দিয়ে একে একে রেনেসাঁস, রিফরমেশন ও এনলাইটেনমেণ্ট এই তিনটি পর্যায় পত্তন করেন। ফরাসী বিপ্লবের মতো একপ্রকার বিপ্লবের চিন্তা আসে বিংশ শতাব্দীতে। এতদিনে সেটা রুশবিপ্লবের মতো একপ্রকার বিপ্লবের চিন্তায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু পাঁচ শতাব্দীর ইউরোপকে পাঁচ পুরুষের ভারতে পুনরাবৃত্ত করা শিবের অসাধ্য। তেমন ইচ্ছাও আমাদের নেই। আমরা কেন ইউরোপের পুনরাবৃত্তি করতে যাব? আমাদের কি নিজেদের ঐতিহ্য নেই? আমাদের কি আত্মসম্মান নেই? প্রাচীন ভারত কি প্রাচীন গ্রীস রোমের চেয়ে কিছু কম? প্রাচীন ভারতই ছিল মধ্যমণি। আমাদের মনের কথাটা

রেনেসাঁস নয়, রিভাইভালিজম। প্রাচীন ভারতের রিভাইভাল। মুসলমান হল আদি খলিফাদের যুগের রিভাইভাল। এই যে অতীতের প্রতি টান এই পিছুটান আজকের দিনেও সক্রিয়। অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া এখনো বাকী।

সমগ্র মানবজাতির সমুদয় অতীতই আমাদের উত্তরাধিকার। কিন্তু ভারতীয় আমরা আমাদের ভারতীয় উত্তরাধিকার সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আগ্রহী। কিন্তু এর উদ্দেশ্য যদি হয় পৃথিবীর লোককে ডেকে বলা, "শোন, শোন বিশ্ববাসী, আমরাই বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার ও সংস্কৃতির গৌরবময় উত্তরাধিকারী আর সেই বনিয়াদের উপর আবার আমরা বিশ্বের নবীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৌধ নির্মাণ করতে মনস্থ করেছি" তবে সেটা হবে হাস্যকর দাম্ভিকতা। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা প্রাচীনতম বলছেন সুমেরিয়ার সভ্যতাকে তার পরে মিশরের সভ্যতাকে, তার পরে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতাকে, তার পরে চীনের সভ্যতাকে। এসব দেশের লোক কেউ আর্য ছিল না। এরা সবাই আর্যপূর্ব। আর্যভাষা-গুলিই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগোষ্ঠী এমনতর দাবী ইউরোপীয় আর্যভাষীরাও করেন না। তাদের উত্তরাধিকার আর্য থেকেই শুরু নয়। সুতরাং আর্যকে তারা যত প্রাচীনই হোক না কেন তার চেয়েও প্রাচীন বলতে অনিচ্ছুক। এই যে সকলের চেয়ে প্রাচীন হবার অহঙ্কার এটা একপ্রকার হীনতাবোধের পরিচায়ক। এতে নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই প্রতারিত করা যায় না। প্রমাণ দাখিল করার সময় তো বেদ ভিন্ন আর কোনো প্রাচীন প্রমাণ মাটির উপরে ছিল না। এই শতাব্দীর প্রথম পাদেই মোহেন্‌জো-দরো আর হরপ্পা মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। তারই জোরে সভ্যতার ইতিহাসে তৃতীয় স্থান অধিকার করা গেছে। হরপ্পা আর মোহেন্‌জো-দরো নাকি বেদেই আছে। কেউ জানতে পারেনি। বৈদিক আর্য না হলে আর কে অমন পুরী নির্মাণ করতে পারে?

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেই সদূরতম অতীতের পুনরুজ্জীবন কেমন করে সম্ভব? যাঁদের জীবনের ব্রত হলো মৃতের পুনরুজ্জীবন তাঁরা কেমন করে তাঁদের ব্রত সমাপন করবেন? মাটি খুঁড়ে আরো কয়েকটা নগর পাওয়া গেছে, সিন্ধু সভ্যতা এখন আর সিন্ধু প্রদেশ বা পাঞ্জাবেই নিবদ্ধ নয়। আরো পুবে, আরো দক্ষিণে ছড়িয়েছিল। দাবীটা আর্য-ভাষীদের তরফ থেকে না হয়ে তাদের পূর্ববর্তীদের তরফ থেকে হলে আমাদের অনার্য-ভাষীরাও আনন্দিত হবেন। শতকরা একশোজন ভারতবাসী কখনো আর্যভাষী ছিল না। আগন্তুক হোক আর নাই হোক আর্যভাষীরা সংখ্যালঘুই ছিল। লোকসংস্কৃতির কথা বাদ দিলে যে-কোনো সংস্কৃতিই অল্পসংখ্যকের কাজ। তাঁরা মুনি ঋষিই হোন আর রাজারাজড়াই হোন, আর গায়ক বাদক নর্তকই হোন, আর কবি চিত্রকর ভাস্করই হোন, আর দার্শনিক বৈজ্ঞানিকই হোন তাঁরা জনগণ নন, জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ। রেনে-সাঁসের প্রথম সওয়া শো বছরে শিল্পী সাহিত্যিক কারিগর প্রভৃতির সংখ্যা ছিল ছ'শো জনের মতো। এটা হলো ইটালীর হিসাব। বেশীর ভাগই নাগরিকও অবস্থাপন্ন। তার দরুন ইটালীর রেনেসাঁসের মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। এসব ক্ষেত্রে সংখ্যাই বড়ো কথা নয়। নতুন সৃষ্টি, নতুন সত্য, নতুন আলো, নতুন রস, নতুন ধ্যান, নতুন বিশ্ববীক্ষা, নতুন জীবনদর্শন এইসব জিনিসের গুণগত উৎকর্ষের পরিমাপ করতে হয়। পুরাতনেরও নব

মূল্যায়ন হয়। বিস্তর জিনিস ফেলে দিতে হয়, ভুলে যেতে হয়। আবর্জনাকে মূল্যবান বলে সাজিয়ে রাখতে গেলে ঘরটাই হয়ে ওঠে জাদুঘর। পুনরুজ্জীবন তারই হতে পারে যার কেবল অতীত নয়, ভবিষ্যৎও আছে। তপোবনের কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে? না, রাজসভার? না, দেবদাসীদের? না, রাজনর্তকীদের? না, অন্তঃপুরিকাদের? না. তাঁদের প্রহরারত কঞ্চুকীদের? তথা সেবায় নিযুক্ত দাসদাসীদের? সেকালের বড়ো বড়ো ইমারতগুলো তৈরি হয়েছিল গরিবদের বেগার খাটিয়ে কিংবা যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস বানিয়ে।

সংস্কৃতি বলতে যেকালে ধর্মমূলক সংস্কৃতি বোঝাত সেকালে সংস্কৃতির উৎপত্তি ও চর্চার পীঠস্থান ছিল মুনি ঋষিদের আশ্রম, সাধু সন্ন্যাসীদের মঠ বা বিহার, দেবদাসী ও তাদের সহযোগী গায়ক বাদকদের দেবস্থান। কিন্তু রাজসভা ও শ্রেষ্ঠীভবন কি তা হলে কেবল ধর্মমূলক সংস্কৃতি নিয়েই সন্ধ্যা বিনোদন করত? তাদের জন্যে প্রয়োজন হতো আরেক প্রকার সংস্কৃতির। সদর মহলেই প্রবেশ ঘটত বাসবদত্তা, আম্রপালী, বসন্তসেনা প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত গণিকাদের। তাঁদের সদনেও সম্মিলিত হতেন রাজ অমাত্য, শ্রেষ্ঠীসুত ও নগরের মান্য গণ্য কবি নাট্যকার সঙ্গীতকারগণ। মর্ত্যের গণিকাদের দেখেই কল্পনা করা হতো স্বর্গের অপ্সরাদের। যাঁরা তপোবনে গিয়ে মুনিদের তপোভঙ্গ করতেন ও তাঁদের দ্বারা সন্তানবতী হতেন। তেমনি একটি সন্তানের নাম শকুন্তলা। আর সেই সন্তানের সন্তান দুষ্মন্তপুত্র ভরত। আর সেই ভরতের নামেই ভারতবর্ষ। এর জন্যে আমরা ভারতীয়রা কি মেনকার কাছে ঋণী নই? তার মানে কোনো এক বাসবদত্তা বা বসন্তসেনার কাছে? সেকালের হিন্দু সমাজের এ নিয়ে লজ্জাবোধ ছিল না। বসন্তসেনারাও চারুদত্তদের কুলবধূরূপে সাদরে গৃহীত হতেন। তখন কিন্তু তাঁরা আর সদর মহলে পদার্পণ করতে পারতেন না। অন্দর মহলেই অসূর্যম্পশ্যা হতেন। কঞ্চুকীরা তাঁদের তত্ত্বাবধান করতেন। গণিকারাও বিবাহ করতেন, কিন্তু তাঁদের স্বামীরা থাকতেন তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে। ওদিকে নৃত্য গীত রঙ্গরস যাঁদের সঙ্গে চলছিল তাঁদের সঙ্গে চলত। এ প্রথা এখনো বহমান।

প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতিতেও নৃত্যগীত পটীয়সী হিটাইরা বা হেটিরাদের অনুরূপ মর্যাদা ছিল। রণনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস তো শেষ জীবনটা আসপাসিয়ার আলয়েই কাটিয়ে দেন। আসপাসিয়ার বাসগৃহ ছিল এ্যাথেন্সের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তথা দার্শনিকদের সামাজিক কেন্দ্র। সোক্রেটিসও সেখানে প্রায়ই তর্কে যোগ দিতেন। পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর আসপাসিয়ায় অনুরক্ত হন লিসিক্লিস বলে এক বণিক। সেই নারীই সেই পুরুষটিকে শিখিয়ে পড়িয়ে প্রথমশ্রেণীর বক্তায় পরিণত করেন। সেকালে শিক্ষিতা বলতে প্রধানত সমাজের ওই শ্রেণীর নারীদেরই বোঝাত। কেবল গ্রীসে নয়, সর্বত্র। তাঁরাও ছিলেন সামাজিক মানুষ, সমাজের অন্তর্গত। সমাজের বহির্ভূত হওয়ার রেওয়াজ আসে মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় চার্চের শাসনে। নারীকে সরাসরি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যারা সামাজিক আর যারা অসামাজিক। এ গণনা প্রাচীন হিন্দু বা গ্রীক বা চীনাদের ছিল না। জাপানীদের এখনো নেই। গেইশাদের সমাদর কেবল অবসর বিনোদনের বেলা নয়।

শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর বলে অন্য সময়ও। তবে ইদানীং নারীপ্রগতির হাওয়া বইছে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে নৃত্যে গীতে অভিনয়ে কুলবালিকারাও পারদর্শী। কিন্তু বিবাহ করলে আর চর্চার অবকাশ থাকে না। চর্চা না করলে আর সমকক্ষ হওয়া যায় না। পুরুষ তখন গেইশার আগুনে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দেয়। শোনা যায় গৃহিণীরাই নাকি তখন অফিসফের্তা কর্তাদের গেইশাদের নিবাসে পৌঁছে দিয়ে আসেন। সেটাই যেন ক্লাব।

'সমাজ', 'সমাজ' করে যাঁদের রাতে ঘুম নেই তাঁদের মনে রাখা উচিত যে ধর্মমূলক সংস্কৃতির মতো সমাজমূলক সংস্কৃতিও সবাইকে তৃপ্তি দিতে পারবে না। রাজতন্ত্র গেছে, শ্রেষ্ঠীতন্ত্রও যাবে, কিন্তু কলাবিদ্যার উৎকর্ষের জন্যে যাদের দিকে তাকাতে হবে তারা কি কট্টর সামাজিক মানুষ হবে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির নেই। যারা কট্টর সামাজিক মানুষ নয় তাদের কাছে কট্টর সামাজিক সংস্কৃতি আশা করা বিড়ম্বনা। তথা-কথিত অপসংস্কৃতির আগুনের দিকেই সাধারণ মানুষ পতঙ্গের মতো ছুটবে। মর্ত্যের স্বর্গেও উর্বশী, রম্ভা, মেনকারা থাকবেন। নইলে লোকে স্বর্গে যাবার জন্যে তপস্যা করতে চাইবে কেন?

সংস্কৃতির উদ্ভব যে কবে কেউ তা জানে না। তার আদিতম নিদর্শন দুর্গম পাহাড়ের নির্জন গুহাগাত্রে আঁকা মৃগয়ার চিত্র। যেমন ইউরোপে তেমনি আফ্রিকায়, তেমনি ভারতে। মির্জাপুর জেলার বিন্ধ্যাচলের একটি গুহায় গণ্ডার শিকারের ছবি আঁকা। পণ্ডিতদের অনুমান বয়স দশ হাজার বছর। হোশঙ্গাবাদ গুহার জিরাফও তার সমসাময়িক। কাইমুর গিরিমালার হরিণও তাই। দশ হাজার বছর আগে বন ছিল, জঙ্গল ছিল, পাহাড় ছিল, গুহা ছিল, কিন্তু গ্রাম ছিল না, নগর ছিল না। তা হলে মৃগয়াজীবী মানুষের বসত ছিল কোথায়? সম্ভবত ওইসব গুহাতেই। জীবজন্তু শিকার করে ফলমূল আহরণ করে পাথরের হাতিয়ার বানিয়ে তাই দিয়ে লড়াই করে ওরা প্রাণধারণ করত। সেইরকম অবস্থায় যে তারা চমৎকার সব ছবি আঁকতে পারত এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। মানুষের শিল্পবোধ সৌন্দর্যবোধ যে কত গভীর ও কত পুরাতন এই তার প্রমাণ। যাযাবর হলেও সে সংস্কৃতিমান। অসভ্য হলেও সে অদ্ভুত সম্ভাবনার আধার।

আরো পাঁচ হাজার বছর বাদে দেখা গেল সে সভ্য বলে গণ্য হয়েছে। তার সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা। তার অধিষ্ঠান হরপ্পা ও মোহেন্‌জো-দরো উৎখনন করে আবিষ্কৃত দুটি নগরে। নগর দুটির প্রকৃত নাম কী ছিল কেউ জানে না। সুবিধার খাতিরে বর্তমান অবস্থান অনুসারে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

অরণ্য থেকে নগর। এর মাঝখানে নিশ্চয়ই একটা মিসিং লিঙ্ক ছিল। তার নাম গ্রাম। তার চারদিকে কৃষিক্ষেত্র। মৃগয়া থেকে কৃষিতে উন্নীত হয়েছে মানুষ। তথা পশুপালনে। কিন্তু তার সংস্কৃতির কোনো নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নানাস্থানে নব প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া যাচ্ছে। আর মাটির পাত্র। তাতেও মানুষের কারিগরির প্রমাণ মেলে। তাকে সভ্য বলে গণ্য না করলেও যাযাবর বা বর্বর বলে অবজ্ঞা করা যায় না। সভ্যতা বলতে পণ্ডিতরা নাগরিক সভ্যতাই বোঝেন। তাঁদের মতে সিন্ধু সভ্যতা হচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় সভ্যতা। প্রথম হচ্ছে সুমেরীয়। দ্বিতীয় মিশরীয়। সিন্ধুর পরে চীন।

গ্রামের প্রাণ কৃষি ও কারুশিল্প। নগরের প্রাণ শিল্প ও বাণিজ্য। কিন্তু নগরের লোকের খোরাক আসবে কোন্‌খান থেকে, যদি আশে পাশে গ্রাম না থাকে? যদি সেখানে খাদ্যশস্য উৎপন্ন না হয়। আর গ্রামের লোকেরই বা ঘরবাড়ী বানাবার জন্যে কাঠ আসবে কোন্‌খান থেকে? যদি আশে পাশে বনজঙ্গল না থাকে। দুটো বড়ো বড়ো নগর ছিল বলে একটাও গ্রাম ছিল না তা নয়। অন্তত দু'শোটা গ্রাম ছিল। সেখানকার লোক শহরে আসত কেনাকাটা করতে, কাজকর্ম করতে, থেকেও যেত সেখানে। আর

ধারে কাছে বনজঙ্গলও ছিল। যেমন কলকাতার অদূরে সুন্দরবন।

হরপ্পা ও মোহেন্‌জো-দরো বাণিজ্য থেকে লাভবান হতো। তার সমৃদ্ধির প্রতিফলন তার নগরস্থাপত্য, দুর্গ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি। এসব এত উন্নত মানের যে অনায়াসে ধরে নিতে পারা যায় তারা সঙ্গীতচর্চা, চিত্রচর্চা, ভাস্কর্যচর্চা, নৃত্যচর্চা, নাট্যচর্চাও করত। বিদ্যাচর্চাই বা কেন বাদ যায়? যেসব সীল পাওয়া গেছে তার উপর কী লেখা রয়েছে তার অর্থ উদ্ধার করা একালের পণ্ডিতদের পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। কিন্তু যা লেখা রয়েছে তা মূর্খদের জন্যে মূর্খদের লেখা নয়। লোকে সেকালের উপযোগী লেখাপড়া জানত।

সিন্ধু উপত্যকার বাইরেও আরো কয়েকটি নগর ও বন্দর উৎখনিত হয়েছে। সেগুলিও খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বের। পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা গেছে। মনে হয় সিন্ধু সভ্যতার পরিধি উত্তরপশ্চিম ভারতব্যাপী ছিল। তা বলে সর্ব-ভারতব্যাপী নয়। সামুদ্রিক বাণিজ্যই যদি ওই সভ্যতার সমৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে তবে তার ক্রয়বিক্রয়ের সম্পর্ক স্বভাবত অপর এক সভ্যতার সঙ্গে। নিকটতম অপর সভ্যতা ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী সুমের দেশের। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াতের যে সুব্যবস্থা একালে আমরা দেখতে অভ্যস্ত পাঁচশো বছর আগেও তা ছিল না। পাঁচ হাজার বছর আগে থাকবে কী করে? সারা উপমহা-দেশটাই বনে জঙ্গলে পাহাড়ে নদীতে ভরা। স্থলপথ ছিল না। জলপথ বলতে নদীপথ। সিন্ধু থেকে কোনো মতে যমুনা পর্যন্ত আসতে পারলে নদীপথে গঙ্গা যমুনাসঙ্গমে ও সেখান থেকে সাগরসঙ্গমে আসা যেতে পারত। কিন্তু সিন্ধু থেকে যমুনা পর্যন্ত আসতেই কয়েক হাজার বছর লেগে যায়। তার আগে তখনকার দিনে ছিল সরস্বতী নদী। কবে কে জানে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মাটি খুঁড়ে এখনো কোনো পাথুরে প্রমাণ মেলেনি, কেমন করে স্থলপথে সিন্ধুর সঙ্গে সরস্বতীর ও তার পরে যমুনা গঙ্গার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের যে কয়খানি গ্রন্থ অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে তাদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীকদের সম-সাময়িক গ্রন্থ মিলিয়ে পড়লে প্রাচীন ভারতের একটা আংশিক আলেখ্য পাওয়া যায়। তার সবটা ইতিহাস হিসাবে প্রামাণিক নয়। মোটামুটি বোঝা যায় হরপ্পা ও মহেন্‌জো-দরো খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পরিত্যক্ত হবার পর পর নতুন একপ্রকার মানুষ আরো পশ্চিম থেকে প্রবেশ করে। তারা আর্যভাষী। তাদের ভাষা এক হলেও জাতি এক কি না জোর করে বলা যায় না। ভাষা ও জাতি একার্থক নয়। তবে এতকাল আমরা এক বলে ভাবতে অভ্যস্ত। তাই সেই আগন্তুকদের বলি আর্যজাতি। তারা যে সবাই একসঙ্গে বা এককালে আসে তা নয়। তারা আসে বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন সময়ে। কারো কারো মতে মোহেন্‌জো-দরো ও হরপ্পার পতনের জন্যে তাদের একদলই দায়ী। কিন্তু অমন পরিপাটী নগর থাকতে তারা সাধ করে গ্রামে গিয়ে গোরু চরাবে কেন, বনে গিয়ে বেদ রচনা করবে কেন? নাগরিক সভ্যতার উপর অতখানি বৈরাগ্য বা বিরাগ কি মানুষে সম্ভব? তা ছাড়া নগর দুটোকে ধ্বংস করে দেবার মতো অস্ত্রশস্ত্রও তাদের হাতে ছিল না। ধ্বংসের তেমন কোনো চিহ্নও নেই। রাস্তায় নরকঙ্কাল

পাওয়া গেছে, তার মানে কি এই যে সে কঙ্কাল যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির কঙ্কাল ? মহামারীতে মৃত মনে করলে কি ভুল হবে ? মহামারীতে শহরকে শহর উজাড় হয়ে যাবার দৃষ্টান্ত নানা দেশের ইতিহাসে রয়েছে। মহাপ্লাবনেও শহর জনশূন্য হয়ে যেতে পারে। টিকে থাকে কেবল ইমারত।

এখন পর্যন্ত তেমন কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায়নি আর্যভাষীরা কেন নাগরিক হবার সুযোগ উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় মৃগয়াজীবী বা ফলমূল আহরণকারী বা পশুপালনকারী বা ভূমিকর্ষণকারী হয়ে পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেখান থেকে যায় মধ্যদেশে। তার পরে উত্তর-পূর্ব মুখে উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ মুখে পশ্চিম ভারতে। আগে থেকেই সেসব অঞ্চলে জনবসতি ছিল। স্থানীয়দের সঙ্গে আগন্তুকদের লড়াই হয়। শৌর্যে বীর্যে তারাও কিছু কম ছিল না। বিষয়বিভবে তারাই ছিল আরো উন্নত। দস্যু বা দাস বলে তাদের নিন্দা করা যেন নেটিভ বলে ভারতীয়দের নিন্দা করা। পরাজিত হয়ে তাদের অনেকেই দাক্ষিণাত্যে চলে যায় ও সেখানে তাদেরই মতো মানুষদের সঙ্গে মিলে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি গাড়ে। আর্যভাষীরা দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে তাদের পরাজিত করেনি। তবে তারা বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছে। পূর্ববর্তীকালে তাদের কাছ থেকে এসেছে বৈষ্ণব প্রভাব। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় খণ্ডকে অখণ্ডতা দিয়েছে সংস্কৃত ভাষা। সেই সূত্রে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হয় খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। ততদিনে সভ্যতার ভারকেন্দ্র সিন্ধু উপত্যকা থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। দেখা দিয়েছে কাশী, কোশল প্রভৃতি ষোলটি স্বাধীন রাজ্য। মাথার উপরে কোনো সম্রাট বা রাজচক্রবর্তী নেই। কিন্তু গ্রামে গ্রামে চাষবাস, শহরে শহরে শিল্প বাণিজ্য। স্থলপথে দক্ষিণ ভারতে যাতায়াত করা যায়। নদীপথে বাংলাদেশে। সেখান থেকে সমুদ্রপথে সিংহল দেশে। স্থলপথে দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করে লঙ্কায় যাওয়া হয়তো একবারই ঘটেছিল। কিন্তু পণ্ডিতদের কারো কারো মতে লঙ্কা বলতে সেকালে সিংহল বোঝাত না। বোঝাত মধ্যপ্রদেশের কোনো এক হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত এক দ্বীপ। পরবর্তীকালে সেটা প্লাবিত হয়ে রামায়ণের লঙ্কায় পরিণত হয়। বানর ও রাক্ষস বলে কথিত প্রাণীরা বিভিন্ন উপজাতির মানুষ।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস নেই। আছে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ। সমসাময়িক কালে রচিত নয়, পরবর্তীকালে গ্রথিত। রামায়ণ ও মহাভারত গোড়ায় বোধ হয় ব্যালাড বা চারণগীতি ছিল। যেমন গ্রীকদের ইলিয়াড ও অডিসি। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে হতে হাজার বছর পরে লিখিত আকার পায়। বর্ণিত ঘটনা হাজার বছর আগেকার। আর্যভাষীদের দুই দলের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর আর্যভাষীদের এক রাজার সঙ্গে দ্রাবিড়ভাষীদের এক রাজার যুদ্ধ। এ রকম দুটো যুদ্ধ ইতিহাসে ও ভূগোলে ঘটে থাকতেও পারে। ঘটেনি বললে কম করে বলা হয়। আবার অবিকল ওই জায়গায় ওইসব বীরদের নিয়ে ঘটেছে বললেও বাড়িয়ে বলা হয়। হস্তিনাপুরের ও অযোধ্যার মাটি খুঁড়ে সত্য উদ্ধার করতে কেউ কেউ উদ্‌গ্রীব। রাম লক্ষ্মণ সীতার কাহিনী বৌদ্ধদের 'দশরথ জাতকে' অন্য একভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেটাই সিংহলে

প্রচলিত। তাতে রাম সীতা ভাইবোন। ভাইবোনের বিবাহ প্রাচীন মিশরে প্রচলিত ছিল। এদেশে ছিল বলে বিশ্বাস হয় না। তা হলে বৌদ্ধ কথকরা গেলেন কোথায়? জাতক হলো গৌতম বুদ্ধের বহুসংখ্যক পূর্বজন্মের আখ্যান। সুতরাং ভাইবোনের কাহিনীটা অতি পুরাতন স্মৃতিলব্ধ হতে পারে। হয়তো আর্যপূর্ব যুগে সে রকম প্রথা অজানা ছিল না। রামায়ণের মূল কাহিনীটাও আর্যপূর্ব হতে পারে। তেমনি মহাভারতের মূল কাহিনীটাও। পাঁচ ভাইয়ের এক স্ত্রী তো আর্যভাষীদের প্রথা হতে পারে না। মহাভারত যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে জাতকই বা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার বছরের মধ্যে আর্য ও আর্যপূর্ব ঐতিহ্য একাকার হয়ে গেছে। পরম্পরা ও পৌর্বাপর্য হারিয়েছে। মধ্যদেশ অতিক্রম করে অযোধ্যায় যেতে হয়। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই পূর্বে, লঙ্কার যুদ্ধ পরে। যদি আদৌ ঘটে থাকে। মহাকাব্যের বিষয় ও তার লিপিবদ্ধ রচনাকাল এক নয়। মাঝখানে যদি হাজার বছর ব্যবধান থাকে তবে পরবর্তী ঘটনার বিবরণ পূর্ববর্তীকালে রচিত হয়ে থাকতে পারে, পূর্ববর্তী ঘটনার বিবরণ পরবর্তীকালে। বেশীর ভাগই তো স্মৃতি থেকে রচিত। কেই বা ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী ছিলেন? ব্যাস কিংবা বাল্মীকি যে একজন ব্যক্তি ছিলেন এটাও বিতর্কিত। মহা-কাব্য দুটিতে একাধিক ব্যক্তির হাতের ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

আর্যভাষীরা রাজা ও বণিক হয়ে নগরে অধিষ্ঠান করার সময় থেকে রাজধানী ও রাজসভাই হয় নৃত্যগীত চিত্রভাস্কর্য কাব্যনাটক প্রভৃতির চর্চার কেন্দ্র। তার আগে ছিল মুনি ঋষিদের তপোবন। কলাচর্চার নয়, বিদ্যাচর্চার। রামায়ণ ও মহাভারত তপোবনে রচিত হয়ে থাকলে বিস্ময়ের কারণ থাকত না, কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তার পরে মুনি ঋষিদের অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ। তপোবনও ততদিনে তার গুরুত্ব হারিয়েছে। বিদ্যার্জনের জন্যে বালকরা যায় কাশীতে বা তক্ষশীলায়। বেদজ্ঞ গুরুদের নিবাস কাশী। আর বৌদ্ধ পণ্ডিতদের তক্ষশীলা। আরো অনেক শিক্ষাপীঠ ছিল। বৌদ্ধ বিহারগুলির প্রত্যেকটিই শিক্ষাপীঠ। শৈব তথা বৈষ্ণবদের মঠবাড়ীও তাই। রাজসভার মতো দেব-মন্দিরগুলিও ছিল ললিতকলাচর্চার কেন্দ্র। সেখানে ছিল দেবদাসীদেরও নৃত্যগীত সহযোগে আরাধনা। কতকগুলি কলা নারীনির্ভর ছিল। কুলনারী তো সেদিকে যাবে না। অগত্যা বারনারীকেই আসরে নামতে হতো। ললিতকলাচর্চার আরো একটি কেন্দ্র ছিল গণিকালয়।

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে একবার মৌর্যযুগে, একবার কুশানযুগে, একবার গুপ্তযুগে, একবার মোগল আমলে, একবার ব্রিটিশ আমলে। কুশানদের সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোড়ায় বিদেশী হলেও কুশানরা পরে ভারতীয় ও বৌদ্ধ হয়ে যান। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতিরও অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটে। মহাযান শাখার সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। হীনযান বলে যাকে খাটো করা হয় সেই থেরবাদ বা আদি বৌদ্ধধর্মের ভাষা ছিল পালি। বৌদ্ধরা নিজেদের ধর্মকে বলেন সদ্ধর্ম। ব্যক্তিবিশেষের নামে ধর্মকে নামাঙ্কিত করতে তাঁদের অনিচ্ছা। নামাঙ্কনটা ঘটেছে অন্যদের দ্বারা। যেমন হিন্দুদের বেলাও।

তক্ষশীলা থেকে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার হয় মধ্য এশিয়ায় ও সেই পথ দিয়ে চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে। নালন্দা থেকে পাল রাজাদের আমলে তিব্বতে। অশোকের পুত্রকন্যা সমুদ্র পার হয়ে সিংহলে গিয়ে সদ্ধর্ম প্রচার করেন, সকলেই জানেন। দক্ষিণ ভারত থেকে ধ্যানী বৌদ্ধ সাধক সমুদ্র পার হয়ে চীনদেশে যান। সেখান থেকে তাঁর সাধনা জাপানে পৌঁছয়। সেখানে এর নাম ধ্যান থেকে জেন। বার্মা হয়ে থাইল্যাণ্ডে তথা ইন্দোচীনে যান থেরবাদী বৌদ্ধ সাধকরা। বাংলাদেশ বা ওড়িশা থেকে যান আরো একদল বৌদ্ধ সাধক ইন্দোনেশিয়ায়। সুমাত্রা বৌদ্ধদের একটা বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। নালন্দার সঙ্গে সেখানকার বিহারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগসূত্র জাভায় ও অন্যান্য দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা ছড়িয়ে পড়ে। শৈবরাও একই সঙ্গে পাড়ি দেন। বৈষ্ণবরাও। পরবর্তীকালে আরব থেকে ইসলাম এসে সব কিছু সবুজ করে দিলেও বালা-দ্বীপে এখনো হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাধিক। আর সংস্কৃত ভাষা তো অদ্যাবধি মুসলমানদের নামকরণের ভাষা ও সংস্কৃতির অঙ্গ। রামায়ণ ও মহাভারতকে তারা আপনার করে নিয়েছে। এই দুই মহাকাব্যের প্রভাব ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডেও বিদ্যমান। সংস্কৃতের প্রভাবও লক্ষণীয়। খ্রীস্টোত্তর চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাঁদের হাত থেকে রাজশক্তি আরবদের হাতে যায়নি। তাঁরাই কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের মতো ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু আরব্য সংস্কৃতি গ্রহণ করেন না।

মূল ভারত ভূখণ্ডে ইসলাম নিয়ে আসে আরব্য ও পারসিক সংস্কৃতি। যাঁরা ধর্মান্তরিত হন তাঁরা উভয়কেই গ্রহণ করেন। যাঁরা হন না তাঁরাও পারসিক সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। একালে আমরা যেমন খ্রীস্টান না হয়েও ইংরেজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। পারসিক বা ফার্সী ভাষা ছয় শতাব্দী ধরে এদেশের রাজভাষা ছিল। রাজপুত, মরাঠা ও শিখরাও তাঁদের দরবারে সেই ভাষা ব্যবহার করতেন। সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাংলা, হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি লোকভাষার উদ্ভব ও বিবর্তন হয়েছে। তামিল তো আরো আগেই সংস্কৃতর সঙ্গে সহ-অবস্থান করছিল। সেটা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন নয়। তার সাহিত্য বাংলা, হিন্দী প্রভৃতির চেয়ে হাজার বছরেরও পুরনো। অন্যান্য দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষাও সুপ্রাচীন। সংস্কৃত থেকে তারা ধার করেছে অনেক। কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। আর্যভাষীরাও দলে দলে দক্ষিণে গিয়ে বসবাস করেন, কিন্তু তার দরুণ দাক্ষিণাত্য আর্যাবর্তে পরিণত হয় না। আর্য দ্রাবিড় ভেদ চির-কালই ছিল। ধর্মের ঐক্য তাকে মুছে ফেলতে পারেনি। উত্তর দক্ষিণের যোগাযোগের ভাষা সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না এটা ছিল সর্বস্বীকৃত সত্য। কিন্তু উত্তর ভারতে পারসিক ভাষার প্রাধান্যের ফলে এ সত্য ঢাকা পড়ে যায়। দক্ষিণেও মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়। যেখানে হিন্দু রাজারা আত্মরক্ষা করেন সেখানেও সংস্কৃতের স্থান অধিকার করে তামিল বা মালয়ালম। সংস্কৃত পরিণত হয় ধর্মের ভাষায়, পুরোহিতদের ভাষায়, পণ্ডিতদের ভাষায়।

ততদিনে বৌদ্ধরা দেশান্তরী হয়েছে। কতকটা বৌদ্ধবিদ্বেষী হিন্দু রাজাদের দাক্ষিণ্যের অভাবে, কতকটা কাফেরবিদ্বেষী মুসলিম সুলতানদের দাপটে। ইতিমধ্যে

বৌদ্ধরা নিজেরাই বটগাছের ঝুরির মতো বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়। হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি প্রধান শাখাগুলির সঙ্গে বিস্তর অপ্রধান প্রশাখাও ছিল। বৌদ্ধধর্মের ধারক ও বাহক যে সঙ্ঘ, যাকে ধর্মের সঙ্গে ও বুদ্ধের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়, যা ত্রিশরণের অন্যতম শরণ, সেই সঙ্ঘই নিজের দোষে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, হিন্দুর দোষে বা মুসলমানের দোষে নয়। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত কায়স্থদের ঘরে বৌদ্ধ পুঁথি রাখা হতো, তার প্রমাণ আছে। কায়স্থদের নামের পদবীগুলোও বৌদ্ধ যুগের নামের ভগ্নাংশ। একথা অন্যান্য জাতের বেলাও খাটে। ব্রাহ্মণরা ব্যতিক্রম। কিন্তু পাঞ্জাবে নয়। সেখানে দত্ত যাঁদের নামের অঙ্গ তাঁরা ব্রাহ্মণ। আমার এক দত্ত পদবীধারী বাঙালী বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন পাঞ্জাবের বা উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ। বাংলাদেশে এসে সমাজের অভাবে কায়স্থ হয়ে যান। কায়স্থদের মতো এমন একটি অমনিবাস জাত আর নেই। যে যখন পেরেছে ভিতরে ঢুকেছে, জায়গা না পেয়ে বাদুড়-ঝোলা হয়েছে। প্রত্যেকবারের সেনসাস রিপোর্টে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার মুসলমানদেরও ছাড়িয়ে যায়।

তুর্ক ও মোগল আমলে কায়স্থরা চটপট ফার্সী শিখে নিয়ে সরকার, মজুমদার, চৌধুরী প্রভৃতি পদ পায়। জমিদার, তালুকদার, জায়গিরদার হয়। বৌদ্ধ সমাজে তাদের যে মর্যাদা ছিল হিন্দু সমাজে শূদ্র বলে পরিগণিত হয়ে সে মর্যাদা না থাকলেও রাজ দরবারে তাদের মর্যাদা কারো চেয়ে কম নয়। তাঁদের কেউ কেউ 'খান্' উপাধিও পান। অভিজাত বলে গণ্য হন। অর্থাৎ 'লর্ড'। এই উপাধিধারী অভিজাতদের মধ্যে ব্রাহ্মণও ছিলেন, সদ্গোপও ছিলেন। এঁরাই বাংলার হিন্দু ব্যারন। এঁদের মতো মুসলিম ব্যারনও ছিলেন। তুর্ক ও মোগল আমলে রাষ্ট্র আর সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সেটা আর কোনো আমলে হয়নি। রাষ্ট্র যাদের উচ্চতর মর্যাদা দেয় সমাজ হয়তো তাদের নিম্নতর মর্যাদা দেয়। ইংরেজ আমলেও এর ব্যত্যয় হয়নি।

এই সেদিনও ইংরেজ আমলের অন্তিমকালে পাঁচশোটির উপর দেশীয় রাজ্য ছিল। অধিকাংশই হিন্দু। এগুলির সৃষ্টি কি ইংরেজদের, না মোগলদের, না তুর্কদের ? না, এরা হিন্দু আমল থেকেই একভাবে না একভাবে ছিল। সাম্রাজ্য ভারতের ইতিহাসে ব্যতিক্রম। খণ্ড রাজ্যই নিয়ম। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতে ষোলটির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির অবস্থান উত্তর ভারতে ও মধ্য ভারতে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে নিশ্চয়ই আরো কয়েকটি রাজ্য ছিল। তাছাড়া উত্তরপশ্চিম ভারতেও। রাজ্যসংখ্যা কখনো কমে যায়, কখনো বেড়ে যায়। বেড়ে যাওয়ার কারণ সামন্ত রাজাদের স্বাধীনতা ঘোষণা। মোগল আমলেও শত শত সামন্ত রাজা ছিলেন। রাজতন্ত্রের সহকারী সামন্ততন্ত্রও অতি প্রাচীন। সামন্তদেরও রাজসভা ছিল। সভাকবি ছিলেন। সভাপতিও ছিলেন। সভাগায়ক ছিলেন। বাদক, নর্তক ও নর্তকী ছিলেন। এ প্রথা এই সেদিনও দেশীয় রাজ্যে বিদ্যমান ছিল। ইংরেজ লাটসাহেবদের কোনো রাজসভা ছিল না, তাঁরা এর কদর বুঝতেন না। কিন্তু তুর্করা বুঝতেন, মোগলরা বুঝতেন। তাঁদেরও রাজসভা ছিল। হিন্দু প্রথা তাঁরাও মেনে চলতেন। তবে তাঁদের ধর্ম ছিল সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্যের প্রতি বিরূপ। চিত্রকলার

উপরেও বিধিনিষেধ ছিল। এসব ক্ষতি তাঁরা পূরণ করেছিলেন প্রাসাদ, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ, মিনার প্রভৃতি নির্মাণ করে। তা ছাড়া কালক্রমে তাঁরা হিন্দু কবি ও শিল্পীদেরও পৃষ্ঠপোষক হন। ইসলামী বিধিনিষেধ উপেক্ষা করেন। আওরাংজেবও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সমজদার ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি থাকতে তিনি একজন হিন্দু গায়িকাকে ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করেন। তিনি একটি সঙ্গীতগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। হোলি ও দশহরায় মোগল বাদশাহদের অনুরাগ ছিল। তেমনি মহরমে হিন্দু রাজাদেরও। ঈদ উপলক্ষে মুসলিম বন্ধুদের বাড়ী থেকে ভেট তো আমিও পেয়েছি। আমার পিতামহীর মানত ছিল যে আমি মহরমে লাঠি খেলব। আমারও সাধ ছিল যে আমি বাঘ সেজে নাচব। যেমন নাচত আমাদের প্রতিবেশী শিরিয়া নাপিত। সেসব এ জন্মে হলো না।

হিন্দু মুসলমানের বিরোধটাকেই আমরা বড়ো করে দেখি। কিন্তু মিলনেরও দৃষ্টান্ত প্রচুর। ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় এখনো 'মোগল তামাশা' হয়। তার ভাষা ওড়িয়া, বাংলা, উর্দুর খিচুড়ি। নায়করা হিন্দু। উর্দুকে কেউ বিদেশী ভাষা মনে করত না। বহু হিন্দু লেখক উর্দুকেই তাঁদের সৃষ্টির ভাষা করেছিলেন। যেমন একালে ইংরেজীকে করেছেন। গত শতাব্দীতেও ফার্সী ভাষার লেখক ছিলেন কলকাতার বাঙালী হিন্দু। রাজা রামমোহন তো ফার্সী ভাষায় পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ধর্মের জগৎ আর সংস্কৃতির জগৎ এক নয়। মুসলমানও হিন্দু বিষয়ে লিখতে পারতেন। যেমন হিন্দীতে মালিক মুহম্মদ জৈসী ও বাংলায় আলাওল। মুসলিম সুলতান ও রাজপুরুষরাও বাংলা ভাষায় রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করতে উৎসাহ দিতেন।

সংস্কৃতির নতুন এক কেন্দ্র হলো মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা ও মক্তব। সেখানে আরবী ফার্সীর সঙ্গে গ্রীক দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রও পড়ানো হতো। সেই সূত্রে প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির কিয়দংশ আবার ভারতে এসে উপস্থিত হয়। আর পারস্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তো আবহমানকালের। ভারতের একাংশ পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তও ছিল। বেদের সঙ্গে আবেস্তার প্রচুর মিল। পারস্যও আর্যভাষীদের দেশ। লুপ্তপ্রায় সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় আবার রাজভাষাসূত্রে। পারসিক পোশাকআশাক আদবকায়দাও ভারতীয় হিন্দুরা আপনার করে নেয়। বিশেষ করে সামন্ত ও জমিদার শ্রেণীতে। একজন অভিজাত হিন্দুতে ও একজন অভিজাত মুসলমানে দৃশ্যত কোনো তফাৎ থাকে না, উষ্ণীষ বিনা।

সিংহলের মতো দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত রাজ্যগুলি বরাবরই স্বাধীন ছিল। যেমন মৌর্য সম্রাটদের আমলে, তেমনি গুপ্ত সম্রাটদের আমলে, তেমনি তুর্ক সুলতানদের আমলে, তেমনি মোগল সম্রাটদের আমলে, কিন্তু ব্রিটিশ সম্রাটদের আমলে নয়। এইসব রাজ্যের অধিবাসীদের মনোভাব ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বিরোধী, সুতরাং সংস্কৃত প্রাধান্যেরও বিরোধী। তেমনি মুসলিম প্রাধান্যের বিরোধী, সুতরাং পারসিক প্রাধান্যেরও বিরোধী, উর্দু প্রাধান্যেরও বিরোধী। ব্রিটিশ আমলে এরা ইংরেজ প্রাধান্যের বিরোধী হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজ বিদায়ের পর এরা বরং সংস্কৃত তুলে দেবে, হিন্দী তুলে দেবে, কিন্তু ইংরেজী তুলে দিতে নারাজ। এটা কি দাস মানসিকতা? এটা কি চাকুরে মনোবৃত্তি?

মাতৃভাষার প্রতি মমতা এদের কোনো কালেই হ্রাস পায়নি। কিন্তু অপর একটি ভাষার প্রতি এরা মন খোলা রেখেছে। সেটি ধর্মীয় কারণে সংস্কৃত ছিল। কিন্তু বহির্ভারতের সঙ্গে তামিলদের যেমন যোগাযোগ আর কারো তেমন নয়। সিংহলের উত্তরাংশ তামিলভাষী। মালয়ে তামিলভাষীদের সংখ্যা বড় কম নয়। আর সিঙ্গাপুরে তো সরকারী ভাষার একটি ইংরেজী, একটি চীনা, একটি মালয়, একটি তামিল। সকলেরই সমান মর্যাদা। বহির্ভারতের সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগাযোগ যে ভাষার সাহায্যে হতে পারে সে ভাষা তামিলের পরে ইংরেজী। ইংরেজীর সাহায্যেই দক্ষিণীরা কেন্দ্রীয় সরকারে উচ্চ পদ পেয়ে এসেছে, যেমন ইংরেজ আমলে তেমনি কংগ্রেস আমলে। সংস্কৃত বা ফার্সী বা হিন্দীর সাহায্যে এই উচ্চতা সম্ভব হতো না ও হবে না।

ভারতের ইতিহাস লেখা হয় সাধারণত উত্তর ভারতের উপরে জোর দিয়ে। দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতের উপরে নয়। কিন্তু ইতিহাসে এমন কয়েকটি পর্ব গেছে যখন দক্ষিণ অথবা পূর্বই সবচেয়ে প্রভাবশালী। ইংরেজরা কলকাতাকে তাদের সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যধানী করেছিল। কলকাতা থেকে দিল্লীতে প্রব্রজ্যা মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর স্থায়ী বা অস্থায়ী। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একটানা বাঙালী নেতৃত্ব এই পরিবেশেই সম্ভব হয়েছিল। কেবল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও ছিল বাঙালীর অগ্রগামিতা। সেই থেকে বলা হয়েছিল "বাংলাদেশ আজ যা ভাবে বাকী ভারত কাল তা ভাবে।"

তেমনি হর্ষবর্ধনের পর বলতে পারা যেত, "দক্ষিণী আজ যা ভাবে বাকী ভারত কাল তা ভাবে।" সেটা হলো শঙ্কর রামানুজের যুগ। ভারতময় ব্যাপ্ত তাঁদের প্রভাব। সেটা হলো অজন্তা এল্লোরারও যুগ। অজন্তার ফ্রেস্কোর অনুরূপ জাপানের হোরিয়ুজিতে দেখেছি। সেটা হলো কর্ণাটী সঙ্গীতের, ভারত নাট্যের ও কথাকলি নৃত্যেরও যুগ। বিলম্বে হলেও সর্বত্র তাদের সমাদর। দক্ষিণ ভারতের তথা উৎকলের মন্দির স্থাপত্যের মতো উত্তর ভারতে কী আছে? এক একটা মন্দির যেন এক একটা নগর তথা দুর্গ। তবে দক্ষিণ ভারতের কোনো একটি নগর সারা ভারতের রাজধানী হতে পারত না। সে যোগ্যতা তার ছিল না। এখনো নেই। সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার মতো যোগ্যতাও ছিল না ও নেই দক্ষিণের কোনো একটি ভাষার। ভারতের "হার্ট ল্যাণ্ড" বা হৃদয়ভূমি উত্তর প্রদেশই। সেখানে বা তার আশে পাশে বারাণসী, প্রয়াগ, পাটলিপুত্র, দিল্লী। বারাণসী কেবল হিন্দু ভারতের নয়, বৌদ্ধ ভারতেরও প্রাণকেন্দ্র। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম। সরস্বতী যদিও লুপ্ত। পাটলিপুত্র দুই বার সাম্রাজ্যধানী হয়েছে। দিল্লী বার বার।

ব্রিটিশ বড়লাটের রাজধানী কলকাতাই হোক আর দিল্লীই হোক তাঁর রাজসভাকে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলে গণনা করা হতো না। সেখানে না ছিল কাব্যচর্চা, না সঙ্গীতচর্চা, না অন্যান্য কলাবিধির চর্চা। ভারতীয়রা দূরে থাক, ইউরোপীয়রাও জ্ঞানী, গুণী বা শিল্পী হিসাবে সমাদর পেতেন না। কার্জনের মতো দুই একজন বড়লাট হয়তো পুরাতত্ত্ব অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশেরই ছিল দেশীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অবজ্ঞা।

তাঁদের স্বদেশের সংস্কৃতি থেকে তাঁরা দূরে। মেকলের মতো দুই একজন অসাধারণ মনীষী ভিন্ন আর কেউ যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল বর্তিকা বহন করে এনেছিলেন তা নয়। কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগে ইউরোপীয় ধাঁচের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার ও পুস্তকালয় গড়ে ওঠায় ইউরোপকে এদেশের লোক ঘরে বসেই পায়। নিজেদের জন্যে কলকাতার ইউরোপীয় সমাজ যেসব থিয়েটার ও কনসার্ট হল প্রবর্তন করেন সেসব ক্রমে ক্রমে এদেশের লোকের কাছেও উন্মুক্ত হয়। ইউরোপীয়দের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রও আসে। সেইসঙ্গে সাময়িকপত্রও। এদেশের লোকও বই কাগজ ছাপায় ও ছড়িয়ে দেয়। বিদেশীদের আঁকা ছবি এদেশের লোকও দেখতে পায় ও তার নকল করে। তাঁদের গড়া ভাস্কর্যেরও রূপমুগ্ধ হয়, কিন্তু নকল করতে পারে না। বড়লোকরা বিদেশী ধরনের প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কলকাতায় ও অন্যান্য শহরে ইউরোপীয় রীতির স্থাপত্য মাথা তোলে। তার পৃষ্ঠপোষক কেবল ইউরোপীয় নয়, ভারতীয় বণিকরাও।

যাঁরা উভয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন তাঁরা একটা সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন। ইউরোপকে তাঁরা এককথায় খারিজ করতে চান না, পুরোপুরি গ্রহণ করতেও নারাজ। সমন্বয়ের জন্যে সাগরপারে যাওয়ারও প্রয়োজন ছিল, গেলেনও কয়েকজন, কিন্তু খ্রীস্টান হলেন না। হলেন ব্রাহ্ম। যাঁদের ব্রাহ্ম হলেও আপত্তি তাঁরা হলেন রিফর্মড হিন্দু। সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এই পরিবর্তনটা চলে। কিন্তু এঁদের মতো বহির্মুখী হতেও অনেকের অপ্রবৃত্তি ছিল। তাঁরা হন অতীতমুখী। স্বদেশের অতীতেই তাঁরা খুঁজে পান তাঁদের সংস্কৃতির শিকড়। তার থেকে আসে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের ভারতীয় রীতির চিত্রকলা। প্রাচীন ভারতের পুনরুজ্জীবন যাঁদের লক্ষ্য তাঁদের আদর্শ ভারত ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ অর্থাৎ গুপ্ত সম্রাটদের যুগ। কিন্তু সেকালের মতো রাজসভা কোথায়, বৌদ্ধবিহার কোথায়, হিন্দু মন্দির কোথায়? পৃষ্ঠপোষকতা করবেন কারা? সুতরাং তার জন্যে চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সেটা যদি হয় হিন্দু রাজতন্ত্র তাতে মুসলমানদের কী লাভ? সুতরাং তাঁদেরও চাই বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। হিন্দু রিভাইভালিজম মুসলিম রিভাইভালিজমকে জাগায়, ধ্বনি যেমন প্রতিধ্বনিকে। স্বদেশী আন্দোলনের উলটাপিঠ হয় স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলিম আন্দোলন। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমন্বয়বাদী ভাবনা প্রতিপত্তি হারায়।

দেশ স্বাধীন হয়। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদীরা নিজ বাসভূমি পায়। কিন্তু রাজতন্ত্র ফিরে আসে না। রাজকুলের পৃষ্ঠপোষকতাও না। দেশীয় রাজ্যে যেটুকু ছিল সেটুকু রাজন্যদের নির্বাসনের পর নির্বাণ লাভ করে। সংস্কৃতি যাঁদের উপর বর্তেছে তাঁরা নতুন শাসকদের দরবারে আসন পান না, তাঁরা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে দল উপদল গঠন করেন। রাজসভা বা বৌদ্ধবিহারের অভাব পূরণ করবার মতো কিছু নেই। ইউরোপের মতো স্টুডিও, কনসার্ট হল প্রভৃতিও নেই। না একূল, না ওকূল।

ব্রিটিশ শক্তির অপসরণের পর সংস্কৃতির ভারকেন্দ্র হয়েছে দিল্লীর সঙ্গে পাল্লা সমান রাখার জন্যে করাচী। হিন্দীর সঙ্গে পাল্লা সমান রাখার জন্যে উর্দু। কালস্য কুটিলা গতি। তিন হাজার বছর পরে আবার সেই সিন্ধু সভ্যতা বনাম মধ্যদেশীয় সভ্যতা ফিরে

এসেছে। আবার সেই হরপ্পা বনাম হস্তিনাপুর। পরে পাকিস্তান ত্যাগ করে বাংলাদেশ পৃথক হয়ে গেছে। আরো এক ভারকেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছে ঢাকা যার রাজধানী। এতে কলকাতার গুরুত্ব বাড়েনি, কিন্তু পূর্ব উপকূলের গুরুত্ব বেড়েছে। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে সাগরসঙ্গম একে অনন্য করেছে। এর অতীত না থাক ভবিষ্যৎ আছে। যদি না হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ এর সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটায়। আমরা আশা নিরাশায় দোদুল্যমান।

আমার এক বাংলাদেশী মুসলিম বন্ধু আমাকে গোপনে বলেন যে, তুর্কদের আগমনের পর তিনশো বছর আমাদের দুই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি একটাই ছিল। সেটা দেশীয় সংস্কৃতি, সম্প্রদায়ভেদে বিভক্ত নয়। পরে সেটা দু'ভাগ হয়ে যায়। তখন থেকেই আমাদের দুর্ভাগ্যের সূচনা। এসব কথা তিনি প্রকাশ্যে বলতে সাহস পান না। কিন্তু অনেক গবেষণা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। হিন্দী, উর্দু, বাংলা ও মিশ্র-ভাষা তাঁর নখদর্পণে। আমিও ভেবে দেখেছি যে ইন্দোনেশিয়ার মতো ভারতের সংস্কৃতিও ধর্মভেদ সত্ত্বেও অবিভক্ত ছিল। ধর্মীয় বিষয় বাদ দিলে যা থাকে তা সকলের জন্যে। ট্র্যাজেডী সকলের কাছে ট্র্যাজেডী, কমেডী সকলের কাছে কমেডী। কাহিনী সকলের কাছে কাহিনী। কাব্য সকলের কাছে কাব্য। উর্দু মুশায়রায় হিন্দুদের ভিড় স্বচক্ষে দেখেছি। প্রথম দিকে বিভেদটা ছিল তুর্ক বনাম মুলকি। কবিরের দোঁহায় মুসলমান নেই, আছে তুরুক। এর পরে দেখা গেল মোগলও এসেছে। তখন মোগল বনাম তুর্ক বনাম মুলকি। পরে তুর্ক ও মোগল মিলে এক হয়ে যায়। তখন তাদের যৌথ নাম হয় মুসলমান। তখন থেকে মুসলমান বনাম হিন্দু। হিন্দু বলতে আগে দেশীয় বোঝাত, তখন থেকে বোঝাতে শুরু করে ধর্মীয়। হিন্দীও তাই। তার সঙ্গে পাল্লা সমান রাখতে চায় উর্দু। তখন দেখা যায় হিন্দুরাও উর্দুতে লিখছে। এখনো লেখে। আর তাঁদের স্বয়ংদত্ত উপনাম ফার্সী। যেমন ফিরাক গোরখপুরী।

যে সংস্কৃতি ছিল মিলনের সেতু সেই হলো শেষকালে বিরোধের হেতু। পাকিস্তান চাই। কেন চাই? কারণ ধর্ম দুই, সংস্কৃতিও দুই। হিন্দু বনাম মুসলিম। হিন্দী বনাম উর্দু। এ ধারণা এখনো ব্যাপক। ইতিমধ্যে ইউরোপ থেকে ইংরেজ ফরাসী পর্টুগীজরা এসে নতুন এক সংস্কৃতি প্রবর্তন করেছে। সেটা যারা গ্রহণ করেছে তারা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে একই মানসিকতার শরিক। জিন্না সাহেবও তাঁদের একজন। তাঁর গুজরাটী হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি আমি দেখেছি। কিন্তু মহাকবি ইকবাল যে পন্থা নির্দেশ করেন মহান নেতা জিন্নাও প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষে তাঁর অনুসরণ করেন। এর জন্যে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ভাবুকরাও কম দায়ী নন। রেনেসাঁসকে ব্যাহত করে হিন্দু মুসলিম উভয় প্রকার রিভাইভালিজম। এর ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা শক্ত হয়। গান্ধী, নেহরু প্রমুখ নেতারা এর প্রতিকার হিসাবে পশ্চিমের মতো সেকুলারিজম বরণ করেন। কিন্তু সেটা এত দেরিতে যে তার আগেই জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। দেশভাগ রোধ করতে পারা গেল না। আমাদের জন্যে রেখে গেছেন তাঁরা এই মহাজনপন্থা। সংস্কৃতিও এই পথ ধরে চলবে। সেই পথেই যুগান্তর তথা রূপান্তর।

এই পঁচিশ বছরে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকরা অসাধ্যসাধন করেছেন। তাঁদের গবেষণা ও যন্ত্রকৌশলের কল্যাণে মানুষ এখন মহাশূন্য অতিক্রম করে চন্দ্রলোকে উপনীত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতির তালিকা কম বিস্ময়কর নয়। সব দেখেশুনে মনে হয় মানুষ এখন সর্বশক্তিমান। দুঃখ কেবল এই যে বিজ্ঞানের খাতে যে অর্থব্যয়টা হচ্ছে সেটা আসছে সামরিক প্রয়োজন থেকে। দৃষ্টি রয়েছে সমস্তক্ষণ মহাযুদ্ধের উপরে। আর মহাযুদ্ধ যদি আবার ঘটে তো মহাপ্রলয়ের জন্যে দায়ী হবেন বৈজ্ঞানিকরাই। পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রবর্তনা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে দিয়েছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন।

পরমাণু বিস্ফোরণের চেয়েও ভয়াবহ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন উপায়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধি আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করছে। সব ক'টি উপায় যে ধর্মসম্মত বা নীতিসম্মত তা নয়। ধর্মের অনুশাসন বা নীতির অনুশাসন মেনে জন্মশাসন দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ও অব্যর্থ নয়। ব্রহ্মচর্য তো প্রাচীনকাল থেকেই সুপ্রচলিত। সে যদি অব্যর্থ হতো তবে ভারতের আজ এ দশা কেন? সাধনার অঙ্গ হিসাবে ওর মূল্য আছে, কিন্তু যারা সাধক নয় তাদের সন্তান-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্রহ্মচর্যের ধরাত ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে কোনো সমাজে সাধকের অনুপাত নগণ্য।

জনসংখ্যা স্ফীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে মুদ্রাস্ফীতি। আরো এক ভয়াবহ ব্যাপার। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল যে সাম্যবাদী দেশগুলিতে নাকি মুদ্রাস্ফীতি হয় না। সে ধারণা ক্রমে ক্রমে অপসৃত হচ্ছে। সর্বত্র কলকারখানা, সর্বত্র মারণাস্ত্রের খাতে অনুৎপাদক ব্যয়বৃদ্ধি, অর্থাৎ মাখনের বদলে বন্দুক উৎপাদন, সর্বত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, তার দরুন আরেক দফা মজুরিবৃদ্ধি, তার ফলে আরেক দফা মূল্যবৃদ্ধি, অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার দৃষ্টান্ত সাম্যবাদী পোলাণ্ড। ধনতন্ত্রবাদী ইংলণ্ডের অবস্থাও সঙ্গীন।

কে জানে কতকাল পরে মানুষের হুঁশ হবে যে সামরিক প্রস্তুতি সর্বরোগহর নয়, এমন সব সমস্যা আছে যার কোনো সামরিক সমাধান নেই। তেমনি, চক্রাকারে মজুরিবৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি ও আবার মজুরিবৃদ্ধি ও আবার মূল্যবৃদ্ধি এমন এক সমস্যা যার কোনো রাজনৈতিক সমাধান নেই। প্রত্যেকটি মতবাদের উপর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে, যেমন হারিয়ে ফেলেছে প্রত্যেকটি ধর্মবিশ্বাসের উপরে। মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে চিন্তাশীল ও সবচেয়ে সংবেদনশীল, শিল্পী ও সাহিত্যিক, তাঁরা প্রাণপণে জপ করছেন "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ"। কিন্তু সেটাও তো মূলত একপ্রকার বিশ্বাস। যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে তারা যদি মানুষের উপর বিশ্বাস রাখে তো তৃতীয়

মহাযুদ্ধের দিন সে বিশ্বাসও শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

রেনেসাঁসের পর থেকে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশ ও ব্যাপ্তি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি। মুষ্টিমেয় ধনিকের ভোগ্য ও ভোজ্য এখন কোটি কোটি নাগরিকের ঘরে ঘরে। স্বাধিকার সম্বন্ধে চেতনাও নিম্নতম স্তরে পৌঁছেছে। স্বাধিকার আদায়ের প্রাণালীও বিচিত্র। বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মহম্মদ যে দাসপ্রথা রহিত করতে পারেননি তা গত শতাব্দীতে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরাহত হয়েছে। ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব এই দুই বিপ্লবের মধ্যবর্তী সময়ে ও মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে ভূমিদাসপ্রথা। ব্যাপকভাবে ঘটেছে শূদ্রজাগরণ তথা নারীজাগরণ। ইতিহাসে যারা কখনো কোনো সুযোগ পায়নি তারাও পাচ্ছে ও পাবার আশা রাখে। আধুনিক যুগ অভূতপূর্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। তাই জন্মান্তরে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে কেউ অপেক্ষা করতে চায় না। কিংবা মৃত্যুর পরে স্বর্গবাসের জন্যে। স্বর্গ এই জন্মেই ও এই মর্ত্যলোকেই মানবলভ্য। এর মূলে রয়েছে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস নয়, মানুষের উপর বিশ্বাস। তাই কবিগুরু বলেন, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

কিন্তু ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের মতো মানুষের উপর বিশ্বাসও টলমল করছে। মানবিকবাদীদের পক্ষে এত বড়ো সঙ্কট রেনেসাঁসের পর থেকে আর কখনো ঘটেনি। রেনেসাঁস ঈশ্বরবিশ্বাসের শত্রু নয়। কিন্তু মানববিশ্বাসের মিত্র। মানববিশ্বাস না থাকলে রেনেসাঁসই থাকে না। মানববিশ্বাস অপগত হলে রেনেসাঁসও দেউলে হয়ে যায়। সেই দেউলেপনার লক্ষণ এখন রেনেসাঁসের আদিভূমি পশ্চিম ইউরোপেই প্রকট। বিজ্ঞান অবশ্য দিগ্বিজয়ের পর দিগ্বিজয় করে চলেছে, কিন্তু সাহিত্যে বা দর্শনে তার সমান্তরাল জয়যাত্রা নজরে পড়ছে না। গত ত্রিশ বছরের নোবেল পুরস্কার বিজেতারা তাঁদের পূর্বসূরীদের তুলনায় মাথায় খাটো। আমার বাল্যে ও যৌবনে আমি যেসব বনস্পতির পরিচয় পেয়েছি তাঁরা একে একে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। কেবল রবীন্দ্রনাথের নয়, আনাতোল ফ্রাঁস বা রম্যা রলাঁর বইও আন্তর্জাতিক বাজারে বড় একটা বিকোয় না। এমন কি তাঁদের স্বদেশেও আগের মতো নয়। এক রবীন্দ্রনাথ বাদে। বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস, গলসওয়ার্দি, বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁদের স্বদেশেই তাঁদের জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় তাঁদের তেমন মর্যাদাহানি হয়নি। বরং তাঁদের কেউ কেউ প্রোফেট মর্যাদা লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাঁদের মর্যাদায় ঘা দিয়েছে। তাঁরা দূর থেকে নমস্য। কিন্তু তাঁদের বাণী এখন আর পথনির্দেশ করে না।

কেন এমন হলো? আমি যতদূর বুঝি তাঁরা সকলেই ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর সন্তান। একপ্রকার না একপ্রকার আদর্শবাদের কোলে লালিত। প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁদের প্রবলভাবে ধাক্কা দিলেও রুশ বিপ্লব তাঁদের টাল সামলাতে সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাঁদের একেবারে কাৎ করে দেয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণে হিরোশিমা ও নাগাসাকির গণহত্যা, নাৎসী বন্দীশিবিরে ষাট লক্ষ ইহুদীর গ্যাস প্রয়োগে বিনাশ, একেই কি বলে সভ্যতা? বিপ্লবী রাশিয়ার জয় যাঁদের আশ্বস্ত করল তাঁদের শান্তির

আশাও ভঙ্গ করল। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সন্ধিস্থাপনই তো যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়। এবার দেখা গেল জার্মানদের সঙ্গে সন্ধির সম্ভাবনাই নেই, বিনা শর্তে আত্ম-সমর্পণ বৃথা গেল। বিজেতারাই দুই যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত। সেটা স্নায়ুযুদ্ধ বা শীতল যুদ্ধ। দেখতে দেখতে দুই শিবিরের হাতেই এসে যায় পারমাণবিক অস্ত্র। বুদ্ধিজীবীদের মতিগতিও বিচিত্র। বারট্রাণ্ড রাসেল প্রথমে বলেন, রাশিয়ার হাতে পারমাণবিক অস্ত্র আসার আগেই তাকে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে নিবৃত্ত করো। এ এক সাংঘাতিক জুয়াখেলা। কেউ এগোয় না। এর পরে তিনি মত বদল করেন। পারমাণবিক অস্ত্র কোনো পক্ষেরই হাতে থাকবে না। এটাও এক মারাত্মক ঝুঁকি। কেউ নিতে চান না। তিনি ও তাঁর মতো পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী কতক লোক সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী কিন্তু পারমাণবিক প্রস্তুতির বিপক্ষে নন। প্রস্তুতি চলছে, চলুক। যুদ্ধ না বাধলেই হলো। এঁদের বিশ্বাস ব্যালান্স অভ পাওয়ার রক্ষিত হলে যুদ্ধ বাধবে না। এর নাম ব্যালান্স অভ পাওয়ার নয়, ব্যালান্স অভ টেরর। এসব বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিশুদ্ধির তারিফ করা শক্ত। এঁদের অনেকে সাম্যবাদী। অনেকে সাম্যবাদ-বিরোধী। সাধারণের মতো এঁদের মধ্যেও একপ্রকার ডেথ উইশ বা মরণ বাসনা কাজ করছে। বাঁচবার মতো কোনো মহত্তর স্বপ্ন নেই। ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড এলোন। নিয়তির উপর মানব ভবিষ্যৎ সঁপে দেওয়ার নাম মানবিকবাদ নয়। মানবিকবাদ এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে তার কী ভবিষ্যৎ!

উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদে লালিত দিক্‌পালদের শেষজীবন মোহভঙ্গের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সংঘাত, শ্রেণীসংঘর্ষ, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা, আর্থনীতিক মন্দা, নাৎসী-ফাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর লৌহযবনিকা ও তার বিপরীত দিকে ম্যাক্‌কার্থি পর্ব, এত রকম বিপর্যয় যাঁদের জীবিতকালে ঘটেছে তাঁদের চিন্তায় ও বিশ্বাসে পূর্বসূরীদের মতো নিশ্চিতি প্রত্যাশা করা যায় না। অভিজ্ঞতায় তাঁরা বহুদর্শী, কিন্তু উচ্চতায় তাঁরা দিক্‌পালদের সমতুল্য নন। অথচ বিজ্ঞানীদের বেলা অন্য কথা। বিশেষত ফলিত বিজ্ঞানীদের বেলা। রুশদেশ থেকে একজন বৈজ্ঞানিক এসেছিলেন, আচার্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন তিনি সায়েন্স একাডেমির অধ্যক্ষ। মাসিক বেতন ষোল হাজার রুবল। সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁর চেয়ে বেশি কেউ পান না। রাষ্ট্রনায়করাও না। তাঁর নিজস্ব চাকরবাকরও আছে। ওটা কী রকম সাম্য বোঝা শক্ত। কিন্তু এর তাৎপর্য হলো রুশদেশ তার বৈজ্ঞানিকদের সম্রাটের মতো সম্মান দেয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকরা তেমন প্রতিপত্তিশালী নন। এটা কি কেবল রাশিয়ায়? ধনতন্ত্র দিয়ে মোড়া গণতন্ত্রের দেশেও শিল্পী ও সাহিত্যিকরা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ।

সাহিত্যিকরা কোনো দেশেই সাহিত্যিক হিসাবে পদাধিকারী বা বেতনভুক নন। রয়ালটি থেকে যথেষ্ট আয় থাকলে অন্য কোনো জীবিকা বরণ করেন না। নয়তো করেন। তবে কতক সাহিত্যিকের পারিবারিক সম্পত্তি থেকেও কিছু আয় হয়, তারই উপর নির্ভর করে তাঁরা সংসার চালান। সাহিত্য তাঁদের পেশা নয়, অন্য কোনো পেশাও তাঁদের

নেই। সাহিত্য থেকে যদি এক পেনীও না আসে তবু তাঁদের সংসার অচল হয় না। তবে সাধারণত তাঁরা ই. এম. ফস্টারের মতো চিরকুমার। আবার জেমস জয়েসের মতো এমন সাহিত্যিকও আছেন যাঁদের সংসার চলে পৃষ্ঠপোষকের দেওয়া মাসোহারায়। রাজারাজড়ারাই সেকালে পৃষ্ঠপোষক হতেন। একালে হন বিত্তবান সাহিত্যরসিকরা। কিন্তু ক্রমশই তাঁদের সংখ্যা কমে আসছে। সমাজতন্ত্রী দেশে তাঁদের অস্তিত্বই নেই। ধনতন্ত্রী দেশেও তাঁরা ট্যাক্স জোগাতে গিয়ে ফতুর। পারিবারিক সম্পত্তি থেকেও আয় তেমন হয় না। তার উপরেও ট্যাক্স বৃদ্ধি। ফ্লোবেয়ার বা প্রুস্ত বা আঁদ্রে জিদ আর জন্মাবেন না। জন্মালে তাঁদের চাকরি করতে হবে। লেখার জন্যে অবসর বা মেজাজ পাবেন না। তার নয়তো শুধুমাত্র সাহিত্যজীবী হয়ে সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকের মর্জির উপর নির্ভর করতে হবে। যেমন করতেন ডিকেন্স বা ডসটয়েভস্কি। বড়ো কঠিন সাধনা, সিদ্ধি ক'জনের ভাগ্যে জোটে? বেশির ভাগ সাহিত্যিকই আপিসে আদালতে স্কুল কলেজে রেডিওতে সংবাদপত্রে সওদাগরি ফার্মে চাকরি করেন। চাকরি না করলে ওকালতি বা ডাক্তারি করেন। স্বাধীন ব্যবসা বা চাষবাস করেও কখনো সখনো লেখার অবসর পাওয়া যায়। জমিদারির দিন গেছে।

সব দেশে সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় জমিদারবংশীয় সাহিত্যিকদের দানই অগ্রগণ্য। তার পরে রাজকর্মচারী বা রাজসভাসদদের দান। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ছাপাখানা উদ্ভাবনের পর থেকে। প্রকাশকরা বই ছেপে পাঠকদের হাতে দেন, পাঠকদের কাছ থেকে যা পান তার থেকে লেখকদের রয়ালটি দেন। পাঠকরা সাধারণত নতুন এক শ্রেণীর লোক। যাদের নামকরণ হয় বার্গার বা বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত। এঁদের ঘরের ছেলেরাও ছাপাখানায় বই ছাপান, কাগজ ছাপান। অনেকের পক্ষে সেটা একটা নেশা। কারো কারো পক্ষে পেশা। রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক থিয়েটারের উদ্ভব। দর্শকরা যে দর্শনী দেন তার থেকে একাংশ পান নাট্যকার। শেক্সপীয়ার, মলিয়ের সম্পূর্ণরূপে নাট্যনির্ভর হয়েও জীবনযাত্রায় সফল হন। তবে তাঁরা ব্যতিক্রম। বেশির ভাগই বড়লোকদের আশ্রয় করেন। কিংবা ব্যর্থ হন।

লোকসাহিত্যের কথা বাদ দিলে এমন কোনো সাহিত্যের ইতিহাস আমি জানিনে যে সাহিত্য বার্গার বা বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখক ও পাঠকদের সহযোগিতায় বিবর্তিত হয়নি। সাহিত্য থেকে এরা রস পেয়েছে, তাই সাহিত্যের দায় বহন করেছে। সবাই যে লাভবান হয়েছে তা নয়। ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে বিস্তর মধ্যবিত্ত। যে সময়টা এরা সাহিত্যের সাধনায় নিয়োগ করেছে সেটা বাণিজ্যে বা কৃষিকর্মে বা রাজকর্মে বিনিয়োগ করলে লক্ষ্মীমন্ত হতে পারত। সাহিত্য থেকে ধন সেইসব দেশেই সম্ভব হয়েছে যেসব দেশে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে ও সেইসঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। তার ফলে বইয়ের বাজারে এসেছে অসংখ্য ক্রেতা। অধিকাংশই নয়া মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত উঠতি শ্রমিক। এদের রুচি অনুসারে বই লেখা হয়েছে। এরা নিজেরাও লিখেছে। একসঙ্গে তিন চার হাজার বই ছেপে সস্তায় বিক্রী করাও সম্ভব হয়। খবরের কাগজও তেমনি সস্তা। মাসিকপত্রও কম দামে বেচা যায়। আমরা যারা বিংশ শতকের গোড়ায়

জন্মেছি তারা নামমাত্র দামে বিলিতী বই কাগজ মাসিকপত্র কিনেছি। এক পেনী বা এক আনা দামে বই পাওয়া যায়, আজকাল কেউ চিন্তা করতে পারেন একথা ? ছ'পেনী দামে আমরা বিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস কিনতে পেরেছি। এক শিলিং দামে এভরিম্যানস লাইব্রেরীর ক্লাসিক্স। অক্সফোর্ড ক্লাসিক্স। তাই তো রাশি রাশি পড়তে পেরেছি।

মহাযুদ্ধের পর দাম বেড়ে যায়। দাম না বাড়ালে প্রকাশকদের পোষায় না। তবে উদ্যোগী প্রকাশক যাঁরা তাঁরা মুদ্রণসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে দাম কম রাখেন। বিশেষত দৈনিক সংবাদপত্রের। জার্মানরা আরো বেশি সংখ্যায় ছাপে, আরো কম দামে বেচে। জার্মানীতে ছাপা ইংরেজী বই আমরা আরো সস্তায় কিনেছি, কিন্তু দেশে নিয়ে আসতে পারিনি। আইনে বারণ। ফরাসীরা যে কী করে তার চেয়েও সস্তায় বই বিক্রী করে তার রহস্য আমি জানিনে। সম্ভবত তার কারণ ফরাসীরা লাখে লাখে ছাপে। আরো এক কারণ বোধহয় ছাপা খরচ কম। ছাপাখানার কর্মীরা মজুরি কম নেয়। আমাদের এদেশেও এই সব কারণ সক্রিয় ছিল। তাই আমরা আট আনা দামে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' কিনতে পেরেছি। চার আনা দামে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগটা ছিল বিশ্বসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির যুগ। বহু লেখক শুধু বই লিখেই বা কাগজে লিখেই বেশ ভদ্রভাবে সংসার চালিয়েছেন। সেটা যাঁদের পছন্দ নয় তাঁরা প্যারিসে বা মিউনিকে গিয়ে বোহেমিয়ান হতেন। সস্তা হোটেলে রাত কাটাতেন, সস্তা কাফেতে দিন। লিখেই যেতেন, কেউ পড়ুক আর না পড়ুক। পাঁচ দশজন মিলে একটা ম্যানিফেস্টো ছাড়তেন। এক একটা 'ইজম' প্রতিষ্ঠা করতেন। এঁদেরকে মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া বলে শ্রেণীভুক্ত করা অন্যায়। এঁরা বাউল ফকিরের মতো সমাজবহির্ভূত। বিয়ে করতেন না। সঙ্গিনীর সঙ্গে থাকতেন। মজুরের যে মজুরি সেও তো একপ্রকার অর্থোপার্জন। অর্থোপার্জনকে এঁরা হেয় জ্ঞান করতেন। এই বোহেমিয়ান ধারাটা উনবিংশ শতক থেকেই বহমান। তবে ইদানীং এটা শুকিয়ে যাচ্ছে। আঠারো বছর আগে আবার প্যারিসে গিয়ে দেখি সেই সব কাফে আর নেই, শহরের বোহেমিয়ান অঞ্চলটা জুড়ে এখন বিলাসীদের অট্টালিকা, ব্যবসায়ীদের সৌধ। জমির দাম আগুন। মধ্যবিত্তরা চলে যাচ্ছে শহরতলীতে। অমনি করে কেন্দ্রচ্যুত হচ্ছে। একালের বোহেমিয়ানরাও থাকেন বড়মানুষী চালে।

সর্বত্র মুদ্রাস্ফীতি। তাই দেশে বিদেশে কোথাও আজকাল এক হাজার দু'হাজার কপি ছেপে বইয়ের খরচ ওঠে না। সতীনাথ ভাদুড়ীর অনবদ্য উপন্যাস 'জাগরী' ইংরেজীতে অনুবাদ করে শ্রীমতী লীলা রায় ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বিভিন্ন প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দেন। ওঁরা একবাক্যে বলেন, বই তো ভালোই, কিন্তু পাঁচ হাজার কপি না ছাপলে ইংরেজদের পোষাবে না, দশ হাজার কপি না ছাপলে আমেরিকানদের পোষাবে না। বই এত বেশি বিক্রী হবে না। কেন তা খুলে বলেন না। গরম মশলার অভাব। পাণ্ডুলিপি ঘুরে আসে। শেষকালে প্যারিসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো ভরতুকি দিয়ে সে বই প্রকাশ করে। ইউনেস্কোর প্রকাশন লাভের জন্যে নয়। তার ধনভাণ্ডার আন্তর্জাতিক অনুদানে পূর্ণ। খরচ বাঁচানোর জন্যে বইখানা ভারতীয় এক প্রকাশকের

ব্যানারে ভারতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইউনেস্কো থেকে এইভাবে নানা দেশের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত সুলভে। কিন্তু একটা দেশের ক'খানাই বা ওঁরা নিতে পারেন !

ইংলণ্ডের প্রকাশকদের তরফ থেকে একজন 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য একসঙ্গে দশ হাজার কপি না ছাপলে খরচ পোষায় না। তা হলে দশ হাজার পাঠকের মনোরঞ্জন করতে হয়। এঁদের হাতে পয়সা আছে, বই কিনতেও এঁরা প্রস্তুত, কিন্তু এঁদের আগ্রহের বিষয় হলো নরনারীর যৌনসম্পর্ক। কিংবা হত্যা-বিভীষিকা আর অপরাধীনির্ণয়। সুতরাং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে উপন্যাসের মধ্যে এইসব প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে। নইলে প্রকাশক গ্রহণ করবেন না। এই ভদ্রলোক আরো একটা খবর দেন। প্রকাশকরা উপন্যাস ছেড়ে ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি ভারী ভারী পুস্তক গ্রহণ করছেন, বাজারে চাহিদা আছে। অনেক প্রকাশক উপন্যাস ছেড়ে প্রবন্ধের দিকে ঝুঁকছেন। সীরিয়াস প্রবন্ধ। বেশি দাম দিয়ে ভালো বই কিনতে এঁরা নারাজ নন। এ এক আজব ব্যাপার। এ দেশেও আমরা একই রকম মনোভাব দেখছি। আদিরস বা বীভৎস রস না হলে উপন্যাস জমে না, পাঠক কিনতে চায় না। সুতরাং ওই রসের ছড়াছড়ি। আর বাড়াবাড়ি। অথচ চিন্তাশীল প্রবন্ধ পুস্তকেরও পাঠক মেলে। প্রকাশক পাওয়া যায়। আগেকার দিনে এ দুটি লক্ষণের কোনোটিই ছিল না। উপন্যাস হতো আদিরসবর্জিত, অপাপবিদ্ধ। তাতে প্রণয়কাহিনী থাকলেও সে কাহিনী হতো হৃদয়কাহিনী। যাদের হৃদয় তারা কামগন্ধহীন। তবে আগেকার দিনেও ডিটেকটিভ নভেলের আদর ছিল। ছেলেবেলায় আমি গোগ্রাসে গিলেছি।

মাসিকপত্রের সংখ্যা এখন সব দেশেই কমে গেছে। যে ক'টি টিম টিম করছে সে ক'টিও ছোটগল্প নেয় না, নিলেও সেটা খুব ছোট্ট হওয়া চাই। সেকালের সেইসব নাম-করা মাসিকপত্র 'স্ট্রাণ্ড', 'পিয়ার্সন', 'আর্গোসী' আর বেরোয় না, 'স্ট্রাণ্ড' তার আয়তন কমিয়ে দিয়ে কিছুদিন আত্মরক্ষা করেছিল, পরে লুপ্ত হয়। সাপ্তাহিক পত্র বিলেতে ক্রমশ কমে আসছে, আকারেও খাটো হচ্ছে, অথচ দাম বেড়ে যাচ্ছে ফী বছর। ছোটগল্প ওরা ছাপে না। জার্মানীর হাল যতটুকু জানি একই রকম। ছোটগল্প লেখকেরা তা হলে লেখা ছাপতে দেবেন কোথায় ? বাংলার অবস্থাও সেইরকম হতে চলেছে। জার্মানীতে গিয়ে শুনি ছোটগল্পের সংগ্রহ কোনো প্রকাশক গ্রহণ করতে রাজী নন। কারণ বাজারে বিকোয় না। ইংলণ্ডেও অবিকল সেই মনোভাব। নেহাৎ স্বনামধন্য না হলে কারো ছোটগল্পের বইয়ের পাঠক বা প্রকাশক মেলে না। আমাদের দেশের অবস্থা এখনো ততদূর গড়ায়নি, তবে লক্ষণ সুবিধের নয়। ছোটগল্প লেখার আর্ট একশো বছর আগে ছিল না। কোনো দেশেই না। এই নতুন আর্টটি মাসিকপত্রেরই কল্যাণে বিবর্তিত। মাসিকপত্রের মরণের সঙ্গে সঙ্গে এরও সহমরণ সম্ভবপর। মুনশিয়ানা ছোটগল্পে যেমন দেখানো যায় উপন্যাসে তেমন নয়। কিন্তু বাজার দিন দিন তার উপর বিরূপ। বিশ্বসাহিত্যে মোপাসাঁ ও চেখভ চিরজীবী। এঁদের স্থান কি অপূর্ণ থাকবে ? আর আমাদের সাহিত্যে 'গল্পগুচ্ছে'র স্থান ? বিলেতে আজকাল এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে ছোটগল্পের মতো উপন্যাসের দিনও

গেছে। ওটাও একটা ক্ষীয়মাণ আর্ট। অবক্ষীয়মাণ মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে আর কতকাল লেখা হবে ফেনিয়ে ফাঁফিয়ে উপন্যাস ! রাজারাজড়ারা নেই, নাইট লেডীরাও নেই, বড় ঘরের অবস্থা পড়ে গেছে, মাঝারি ঘর নিয়ে অজস্র লেখা হয়েছে, শ্রমিকদের একঘেয়ে জীবন নিয়ে লিখলে কেই বা পড়বে ? ওরাও তার থেকে নতুন কী পাবে ?

একই সমস্যার উদয় হয়েছে নাটকের অভিনয় নিয়ে। একালের অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই পেশাদার। মুদ্রাস্ফীতির দরুন তাঁদের জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল হয়েছে। তারপর জমির দাম হু হু করে বেড়ে যাওয়ায় থিয়েটারের হল ভাড়াও আকাশ-ছোঁয়া। প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারগুলিকে স্থানভ্রষ্ট করলে দর্শক সমাগম হবে না। তা ছাড়া প্রযোজনার খরচ প্রত্যেকটি খাতে দু'গুণ তিনগুণ হয়েছে। একটি নাটক যদি একাদিক্রমে একবছর কি দু'বছর না চলে তবে খরচায় পোষায় না। লণ্ডনের এক এক করে অনেক-গুলি বনেদী থিয়েটার উঠে গেছে। থিয়েটারের সীট অগ্নিমূল্য। অবশ্য লিটল থিয়েটার আছে, বিভিন্ন শহরতলীতে। অপেশাদার নাট্যকে দল আছে। কিন্তু এমন নাটক কোথায় যা শত শত রজনী ধরে দর্শককে আকর্ষণ করবে ? কেন, আগাথা ক্রিষ্টির 'মাউসট্র্যাপ' ? ওই ডিটেকটিভ নাটক দেখার জন্যে বিশ বছর কি পঁচিশ বছর ধরে সমান ভিড়। কোথায় লাগে শেক্সপীয়ার বা বার্ণার্ড শ ! জার্মানীতে যেমন স্টেট থিয়েটার বা মিউনিসিপাল থিয়েটার ছিল ইংলণ্ডে তেমন ছিল না। প্যারিসের বিখ্যাত থিয়েটার 'কমেদি ফ্রাঁসেজ' রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। বহুদিন থেকে সেইরকম একটি ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্যে ইংলণ্ডেও আন্দোলন চলছিল। কে যে বাধা দিচ্ছিল, কেন দিচ্ছিল তা বলতে পারব না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্ভব হলো সেই স্বপ্নের পূরণ। আঠারো বছর আগে লণ্ডনে গিয়ে দেখে এলুম তার অভিনয়। সরকারের টাকায় চলে। লাভ লোকসানের প্রশ্ন ওঠে না। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও স্বল্পে সন্তুষ্ট। অবশ্য সেদেশের স্বাচ্ছন্দ্যের মান অনুসারে কালজয়ী নাটক দেখানো হয়। কী যে হলো, জানিনে। সম্প্রতি কাগজে পড়ে অবাক হলুম এক ভদ্রমহিলা আদালতে নালিশ করেছেন যে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সমকাম প্রদর্শিত হচ্ছে। সেটা নাকি রোমান আমলের ঘটনা। পরিচালক এই বলে আত্মসমর্থন করছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ। তিনি দর্শকদের মনে ঘৃণা সঞ্চার করে তাদের নিবৃত্ত করতে চান। কিন্তু লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে এটা একটা ব্যবসাদারি চাল। থিয়েটারে যাতে সরকারের লোকসান না হয়।

এরই নাম আর্টের নামে অপসংস্কৃতির প্রশ্রয়। কলকাতায় আমরা পেশাদার রঙ্গালয়ে অপসংস্কৃতির অভিযোগ শুনেছি। তাতে ভিড় আরো বেড়েছে। কমেনি। সরকার জনমতের বিরুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক। লোকে যতদিন গাঁটের কড়ি খরচ করে রঙ্গমঞ্চে তথাকথিত ক্যাবারে দেখতে চাইবে ততদিন তথাকথিত অপসংস্কৃতিও বহাল থাকবে। এ ধরনের অপসংস্কৃতি এদেশে নতুন, কিন্তু আরেক ধরনের অপসংস্কৃতি এদেশে চিরকাল ছিল। ধর্মের প্রলেপ বুলিয়ে দিলেই তা সাধুসম্মত সংস্কৃতি বলে গণ্য হতো। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এসব নাটক সাহিত্যধর্মী নয়। সত্যিকার সাহিত্য অত খেলো নয়। সত্যিকার নাটকের জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, দর্শক তৈরি করতে হবে, লেখক তৈরি করতে

হবে। সুখের বিষয় অভিনেতা অভিনেত্রী প্রস্তুত। আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রীদের মান যথেষ্ট উন্নত। তাঁরা বিদেশী বই নিতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ স্বদেশী বই তুলনায় খাটো। ইংলণ্ডেও নতুন নাটকের মান নেমে গেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে সব দেশেই।

কাব্যগ্রন্থের অনাদর বিংশ শতকের গোড়া থেকেই। এক বিদেশী অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে পড়াতেন। চল্লিশ বছর আগে আমাকে বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ জনপ্রিয়তা আমাকে অবাক করেছে। আর কোন দেশেই কবিরা এমন জনপ্রিয় নন। কবিতা কেউ পড়তেই চায় না। বাঙালীরাই ব্যতিক্রম।" অধ্যাপক আমাদের যে কমপ্লিমেণ্ট দিলেন আমরা কি তার যোগ্য! মোটের ওপর বলতে গেলে কবিতাই সাহিত্যের উপেক্ষিতা। শুধু কবিতা লিখে কারো সংসার চলে না। কিন্তু কেবল উপন্যাস লিখেই কারো কারো চলে। শুধু নাটক লিখেও কেউ কেউ বড়লোক হয়েছেন। এদেশে না হোক্ ভিন্ দেশে। তবে সাহিত্যের মান বজায় রাখতে পেরেছেন ক'জন!

মেয়েটির নাম সুলতানা। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে আসত। আমরা তখন বাঁকুড়ায়। সালটা ১৯৩০। কথাপ্রসঙ্গে সুলতানা বলে, "বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে আমার খুব ভাব।" আশ্চর্য হয়ে ভাবি সে নিজে কি বাঙালী নয়। ওরা কি তবে অবাঙালী? খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওরা বাঙালী মুসলমান। কিন্তু হিন্দুকে বাঙালী ও বাঙালীকে হিন্দু ভাবতে অভ্যস্ত। পার্থক্য বোঝানোর জন্যে নিজেদের মুসলমান বলেই ভাবে, বাঙালী বলে নয়। অপরপক্ষে বাঙালী হিন্দুদেরও একই অভ্যাস। বহুবার শুনেছি, "আমরা বাঙালী, ওরা মুসলমান।" সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'ই তো বলেছে, "আজ মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালীদের খেলা।" ভাগলপুরে কিন্তু ভাষাগত অমিল ছিল। বাঁকুড়ায় বা বাংলাদেশের আর কোথাও তো সেটা ছিল না।

সেই সুলতানাকেই আবার দেখি ১৯৭৪ সালে ঢাকায়। ততদিনে মুক্তিযুদ্ধ ঘটে গেছে। বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমানে ভাষাগত প্রভেদ যে কত গভীর তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয়নি। রক্তপাতই তা বুঝিয়েছে। সুলতানা তখন বাঙালী। হঠাৎ একদিন আমাদের হোটেলের ঘরে এসে হাজির। আমার স্ত্রী তাকে চিনতে পারেন। সে আর সেই ষোড়শী সপ্তদশী নয়। ষাটের কোঠায় পড়েছে। তাকে 'সে' বলা ঠিক হবে না। তিনি একজন বেগম। আমার স্ত্রী সেদিন শয্যাশায়ী। আমি তাঁকে একা রেখে সভায় যাব কী করে তাই ভাবছি। সুলতানা বেগম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর ভার নেন। ঘণ্টা দু' তিন বাদে ঘরে ফিরে দেখি সুলতানা তখনো সেখানে। ইতিমধ্যে ডাক্তার দেখিয়েছেন, ঔষধপত্র কিনেছেন। সবই নিজের খরচে। আমি কী বলে ধন্যবাদ দেব? এবার বোঝা গেল, বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে কে দেখবে?

গত মুক্তিযুদ্ধেও কি সেটা দেখা যায়নি? ওপারের বাঙালীকে এপারের বাঙালী না রাখলে কে রাখত? স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়তো ওপারের মাটিতে বসেই সম্ভব হতো, কিন্তু সরকার পরিচালনার জন্যে এপারে না এলে চলত না। পরে আবার পাঁচিল উঠেছে। বাংলাভাষাকে আড়াল করেছে ইসলাম ধর্ম। ইসলামী রাষ্ট্র পত্তনের উদ্যোগ চলেছে। তা চলুক। কিন্তু আল্লহ্ না করুন, দুর্দিন যদি আবার ওপারে ঘনিয়ে আসে কেবল কি হিন্দুরাই পালিয়ে আসবে, মুসলমানরাও আসবে না? আগের বার তো মুসলমানরাই আসে প্রথমে। গোড়ার দিকে তারাই ছিল সংখ্যাধিক। বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে কে রাখবে? আরব, ইরানী, পাকিস্তানী? এইসব অবাস্তববাদীদের বাস্তববোধ উদয়ের পরে এপারের সঙ্গে ওপারের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হবে।

এই মহৎ কর্মে যিনি আজীবন নিযুক্ত রয়েছেন সেই অশীতি বর্ষোত্তর সাহিত্যসাধক জনাব রেজাউল করিম সাহেবের অসংখ্য নিবন্ধের থেকে বাছাই করে কয়েকটি সঙ্কলিত হয়েছে। বেশির ভাগই দেশভাগের পূর্বে লেখা। তাঁর কথা শুনলে ধর্ম অনুসারে দেশভাগ হয়তো ঘটত না। কিন্তু সাহিত্যিকদের সাধ্য কী যে রাজনীতিকদের হাত থেকে নিরীহ জনগণকে বাঁচায়! ধর্মের নামে ওরা নাচে। পরে প্রাণে মরে বা প্রাণ নিয়ে পালায়। শিক্ষা অমনি করেই হয়। বই পড়ে হয় না। তবু বইয়ের প্রয়োজন আছে স্থায়ী মূল্যও আছে। করিম সাহেবের বাণী কালজয়ী হবে। মৈত্রীর সাধনা কখনো নিষ্ফল হয় না। সময়ে ফল ফলে।

ইতিহাসের যে অলিখিত নিয়ম মেনে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়ায়, তিব্বতে, সিংহলে, বার্মায়, চীনে, জাপানে, কোরীয়ায়, মঙ্গোলিয়ায়, সাইবেরিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে, থাইল্যাণ্ডে, ও অন্যত্র সম্প্রসারিত হয়, যে নিয়ম মেনে খ্রীস্টধর্ম প্যালেস্টাইনের বাইরে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় সম্প্রসারিত হয় সেই নিয়ম মেনে ইসলামও বিশ্বের নানা দেশে ও মহাদেশে সম্প্রসারিত হয়। আলো বাতাসের মতো ধর্মও সম্প্রসারণশীল। দেশের চারদিকে বেড়া দিয়ে তাকে আটকানো যায় না। আটকানো উচিতও নয়। মানুষ তো কেবল জাতীয়তাবাদ নিয়ে বাঁচে না, স্বদেশ নিয়ে বাঁচে না। তার মৃত্যুর পর তার আত্মার কী হবে না হবে সেটাও তাকে ভাবতে হয়। যে ধর্মবিশ্বাস তাকে নিশ্চিতি দেয়, অভয় দেয়, আশা দেয় সেই ধর্মবিশ্বাসের দিকেই সে ঝোঁকে। এমনি আরো কয়েকটি কারণে সে তার পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মের আশ্রয় নেয়। এটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার। কারণ মুক্তি বা স্বর্গ বা নির্বাণ বা স্যালভেশনও ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের ব্যাপার। মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ।

ইসলাম ইতিহাসের নিয়মেই ভারতে আসত ও ব্যাপ্ত হতো। গোল বেধেছে এই নিয়ে যে ইসলাম কেবল একটি ধর্মবিশ্বাস নয়। সে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচর্যা। সমাজ, রাষ্ট্র, আর্থিক ব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক কার্যকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। একই রকম দাবী করে খ্রীস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে কোনো মতে একবার রাজাকে দীক্ষিত করতে পারলে তাঁর শাসনাধীন প্রজাদেরও ছলে, বলে, কৌশলে দীক্ষিত করতে পারা যায়। ধর্ম যদি রাজশক্তির সাহায্য না নিত তা হলে তার সম্প্রসারণ এমন ব্যাপক হতো না। আর রাজশক্তি মানে তো তরবারির শক্তি। তরবারির বিরুদ্ধে মানবাত্মা বিদ্রোহ করবেই। তার থেকে আসে যুদ্ধবিদ্রোহ, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব। ফরাসীরা প্রতিষ্ঠা করে সেকুলার স্টেট, চার্চের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্কই নেই। রাশিয়ানরাও সেকুলার স্টেট প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু সেইখানে ক্ষান্ত হয় না। চার্চের অস্তিত্বই রাখে না। আমাদের এ দেশে তুর্ক, মোগল ও ব্রিটিশ শাসনের সময় রাষ্ট্রের একটা ধর্মীয় বিভাগ ছিল। হিন্দু শাসনে তো ছিলই। সে বিভাগ আর নেই। ধর্মের জন্যে রাষ্ট্র এক পয়সাও খরচ করে না, খাজনা ধার্য করে না। এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ভারতরাষ্ট্র কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করতে চায় না। স্বাবলম্বী হলে প্রত্যেকটি ধর্ম প্রতিষ্ঠান

নির্বিঘ্নে কাজকর্ম করতে পারে। বিবাদ যেখানে বাধছে সেখানে রাষ্ট্রর সঙ্গে নয়, পরস্পরের সঙ্গে।

রেজাউল করিম সাহেবের বই পারস্পরিক বোঝাপড়ার সহায়ক হবে। তাঁর মতে সব ধর্মের একই লক্ষ্য। সত্যিকার ধার্মিক যাঁরা তাঁরা এটা স্বীকার করেন। ঢেঙ্কানাল রাজ্যে আমাদের রাজবাড়াতে মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ, ব্রাহ্ম সকলেই সমাদর পেতেন। দেশীয় রাজ্যে আমার জন্ম ও বাল্যজীবন। আমাদের বাড়ীতেও সকলের জন্যে অবারিত দ্বার। তবে এটার নাম সর্বধর্ম সমন্বয় নয়। প্রত্যেকটি ধর্মের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা নিজের মতো করে বুঝলে চলবে না। অন্যের মতো করে বুঝতে হবে। এর মতো কঠিন কাজ আর নেই। সব ধর্মের একত্ব উপলব্ধি সর্বধর্ম সমন্বয় নয়। সব ধর্মের প্রতি সমান অনুরাগও সর্বধর্ম সমন্বয় নয়। ওটা সমদর্শিতা বা সর্বমত সহিষ্ণুতা।

আর একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ইংলণ্ড বিজয়ের পর বিজয়ী নর্মানরা ধীরে ধীরে ইংরেজ বনে যায়। চীন বিজয়ের পর মাঞ্চুরা ধীরে ধীরে চীনা বনে যায়। তেমনি হিন্দুস্থান বিজয়ের পর তুর্করা ও মোগলরা ধীরে ধীরে হিন্দুস্থানী বা মুলকি বনে যায়। প্রজাদের সবাইকে মুসলিম বানানোর অভিপ্রায় কারো কারো ছিল। কিন্তু সে অভিপ্রায় অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। রাজপুতদের হাতে অস্ত্র ছিল। তারা অকুতোভয়। তাদের নারীরা পরাজয়ের পর অগ্নিপ্রবেশ করত। তারা স্বধর্ম রক্ষা করতে সর্বদা প্রস্তুত। তা ছাড়া অন্যায় হস্তক্ষেপ সইতে না পারলে এক রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য রাজ্যে শরণ নেবার পথঘাট খোলা ছিল। তেমন রাজ্যও ছিল। তাই হাজার বছরেও সব হিন্দু মুসলমান হয়নি। কয়েকটি অঞ্চল বাদ দিলে অন্যত্র হিন্দু সংখ্যাই বেশি। ধর্ম অনুসারে দেশভাগ ইসলামের গতিরোধ করেছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভক্ত করে ভারত রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়কে হীনবল করেছে। পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকরা যত কিছু প্রত্যাশা করে তত কিছু জোগানোর ক্ষমতা ভারতরাষ্ট্রের তুলনায় সেসব রাষ্ট্রের কম।

আরো একটা কথা। ইসলাম আর আরব, পারস্য, আফগানিস্থান ইত্যাদি দেশ এক জিনিস নয়। আরব দেশের লোক মুসলমান হবার পূর্বেই ভারতীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য করত ও সেইসূত্রে সংস্কৃতি বিনিময় করত। অষ্টম শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধুপ্রদেশ জয় করেন তখন সিন্ধ আর হিন্দের মাঝখান দিয়ে হাকরা বলে একটি নদী ছিল। হিন্দের রাজারা সিন্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। সিন্ধের আরব বিজেতারাও হাকরা নদীর সীমান্ত অতিক্রম করতে চেষ্টা করেননি। কয়েক শতাব্দী এইরূপ সহ-অবস্থানেই কেটে যায়। আরব বা ইরান থেকে আর-কেউ আক্রমণ করেন না। আক্রমণটা আফগানিস্থানের দিক থেকে। সেকালে আফগানিস্থান ছিল ভারতেরই অঙ্গ। অধিবাসীরা হিন্দু বা বৌদ্ধ। যেমন কাশ্মীরের অধিবাসীরা। নামও তখন আফগানিস্থান ছিল না। গান্ধার প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ছিল বিভিন্ন অংশের। ধর্মান্তর গ্রহণ এক শতাব্দীর ব্যাপার ছিল না। ছিল বহু শতাব্দীর ব্যাপার। এতকাল পরেও সে দেশে এখনো কিছু হিন্দু অবশিষ্ট আছে। তারা বাইরে থেকে যায়নি। সেখানকারই লোক। সে রকম এক হিন্দুর সঙ্গে আমার

রেলপথে আলাপ। আফগান আক্রমণ ঠিক বিদেশী আক্রমণ ছিল না। ঠিক বিধর্মী আক্রমণও নয়। স্থলতান মাহমুদের একজন হিন্দু সেনাপতি ছিলেন শুনেছি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ। মন্দির ধ্বংসটা মণিমাণিক্য, স্বর্ণ, রজতের লোভে। মন্দিরে এসব স্থরক্ষিত হতো। মন্দিরের আয়ও ছিল রাজদরবারের মতো। ইউরোপে খ্রীস্টানরা ধ্বংস করেছে পেগানদের মন্দির, মুসলমানরা খ্রীস্টানদের গির্জা, প্রটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিকদের মঠবাড়ী। হিন্দু রাজারাও যে আর হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ধ্বংস করেননি তা নয়। দক্ষিণ ভারতে দৃষ্টান্ত মেলে। ধর্মস্থানকে ধ্বংস করে ধর্মকে ধ্বংস করা যায় না। রুশ ও চীনা বিপ্লবীরাও এটা শিক্ষা করেছেন।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে তিক্ত করেছিল রাজ্য অধিকার করার পর ধর্মে সরকারী হস্তক্ষেপ। বাবর হুমায়ুনকে নির্দেশ দিয়ে যান হিন্দুদের ধর্মে হাত না দিতে। তিনি ও তাঁর পুত্র আকবর এ নির্দেশ মান্য করে চলেন। নইলে মোগল সাম্রাজ্য হিন্দুদের হৃদয় জয় করতে পারত না। ইংরেজরা গোড়া থেকেই ঘোষণা করে দেয় যে হিন্দু বা মুসলমান কারো ধর্মেই হস্তক্ষেপ করবে না। তাদের এই উদার নীতিও প্রজাদের হৃদয় জয় করে। আফগান বা তুর্করাও বহুক্ষেত্রে সমদর্শী ছিলেন। যেমন গৌড়ের স্থলতানরা।

রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা মধ্যযুগের রাজারাজড়াদের রীতি ছিল সব দেশেই। ভারতই একমাত্র দেশ নয়। মুসলিম রাজারাও একমাত্র রাজা নন। ইংরেজদের আগমন মধ্যযুগের পরবর্তী যুগে। ইতিমধ্যে ধর্মের থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করার পর্ব শুরু হয়ে গেছে। মানুষ আর নিজেকে ক্যাথলিক বা প্রটেস্টাণ্ট বলে ভাবতে রাজী নয়। ভাবছে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান বলে। এদিক থেকে অগ্রণী ছিল ইংরেজ ও ফরাসীরা। পশ্চাৎপদ ছিল স্প্যানিশ আর পর্টুগীজরা। গোয়ার পর্টুগীজ শাসকরা নির্মমভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায়। তুলনায় ইংরেজরাই যে উদারতর এটা সকলেই অনুভব করে। ফরাসীরাও সমান আস্থা পায়।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ধর্মঘটিত নয়, অর্থনীতিঘটিত। ওরা যদি তুর্ক বা মোগলদের মতো ভারতে থেকে যেত ও ভারতের শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির যাতে ক্ষতি না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখত তা হলে তাদের শাসন তেমন দুর্বহ হতো না। কিন্তু শোষণ করতে করতে সমৃদ্ধ ভারতকে তারা নিঃস্ব করে। সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্র ও দুর্বল করে। যেটা তুর্ক বা মোগলরাও করেনি। মোগলরা বহু হিন্দুকে মনসবদারি দেয়, মানসিংহ প্রভৃতিকে সেনাপতি করে। উচ্চতর অসামরিক পদগুলিকে চার ভাগ করে দু'ভাগ দেয় বহিরাগত মুসলমানদের, একভাগ মুলকি মুসলমানদের ও একভাগ হিন্দুদের। ফলে মুলকি মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের মিলন হয়। বহিরাগতরা ইংরেজদেরই মতো ধনসঞ্চয় করে স্বদেশে পাড়ি দিতেন। অসাধুভাবে অর্জিত সন্দেহে তাঁদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। হিন্দু জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে মুসলিম জমিদার শ্রেণীরও মিলন ছিল। হিন্দু বণিক শ্রেণীর সঙ্গে মুসলিম বণিক শ্রেণীরও। ধর্ম নিয়েও এঁদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। "তুমিও ভালো, আমিও ভালো।"

গোহত্যা, মসজিদের সামনে বাজনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আপস তখনো হয়নি,

এখনো হচ্ছে না। এই রকম কয়েকটি বিষয় বাদ দিলে আপসের মনোভাব দুই পক্ষেই বজায় ছিল। মহরম ও হোলি হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই উৎসব। মহরম এক-প্রকার উৎসবেই পরিণত হয়েছিল। নতুবা হিন্দুরাও লাঠি খেলত না, বাঘ নাচত না। আমার ঠাকুমার মানত ছিল আমি মহরমে লাঠি খেলব। আর আমার শখ ছিল আমিও বাঘ নাচব। কোনোটাই সম্ভব হয়নি। আমাদের পরিবারে গোঁড়ামি যথেষ্ট থাকলেও আমরা বোখারাসাহেবের দেওয়া সিন্নী ও আতাহার মিঞার হালুয়া স্ফূর্তি করে খেয়েছি। আমাদের পেছনের বাড়ীতেই থাকতেন একঘর ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তাঁদের ছেলেমেয়ে-দের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। 'পাঠান মাস্টার' তো আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। কাকাদের বন্ধু বলে আমরা তাঁকে কাকা বলতুম। আমার সব চেয়ে পুরনো ফোটো তো তাঁর পাশে বসেই তোলা। ধুতী পাঞ্জাবী পরা, চাদর গলায় দিয়ে। ফোটোতে এই তাঁর বেশভূষা। ওড়িশায় সব মুসলমানকেই পাঠান বলা হতো। কারা হিন্দু, কারা তুরুক, কারা মোগল, কারা পাঠান, এটাই ছিল মধ্যযুগের গণনা। সাহিত্যে এর যথেষ্ট উদাহরণ। পরবর্তীকালে জাতি অনুসারে পরিচয় না দিয়ে সম্প্রদায় অনুসারে পরিচয় দেওয়া শুরু হয়। এক বাঙালী মুসলিম অধ্যাপকের মতে মুসলিম শাসনের প্রথম তিনশো বছর হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের সংস্কৃতি ভারতীয় ছিল। তিনি দুঃখ করে বলেন, "বিচ্ছেদের সূত্রপাত ষোড়শ শতাব্দী থেকে। পরিণতি দেশভাগ, প্রদেশভাগ।"

শেষকথা হিন্দুরা ইসলাম কবুল করেনি, কিন্তু পারসিক সংস্কৃতিকে স্বাগত জানিয়েছে। পারসিক ভাষা সংস্কৃতের সোদর। পারসিকরা আর্যভাষী। এখনো বহু হিন্দু পরিবারে ফারসী ভাষার আদর। ছেলেরা স্কুলে ফারসী পড়ে।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি একধর্মী নয়, বহুধর্মী (pluralistic)। এখানে বহু ধারা এসে মিশেছে। আদি ধারা হল লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকচিত্র, সব মিলে লোক-সংস্কৃতি। কোনো একটা দেশে লোকসংস্কৃতির চর্চা ও সংগ্রহ করে গ্রামের লোকেরা। আগেকার যুগে ক্লাসিকাল সংস্কৃতির সঙ্গে লোকের যোগাযোগ ছিল, ভাবের আদান প্রদান ছিল। রামায়ণ, মহাভারত বা কালিদাসের সৃষ্টির মূলও ছিল এই ফোক। ব্যালাড বা চারণের গানে হয়ত এগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পরবর্তীকালে তা সাহিত্যিকদের হাতে মার্জিত রূপ পেয়েছে, ক্লাসিকাল সাহিত্যের রূপ নিয়েছে। ক্লাসিকাল সাহিত্যেরও সাধারণীকরণ হয়ে তা আবার ফোকের রূপ নিয়েছে। যেমন তুলসীদাসের রামায়ণ যা যুগ যুগান্তর ধরে সাধারণ মানুষের মন জুড়ে আছে।

সব দেশে আবার সব ধারা থাকে না। আফ্রিকাতে ক্লাসিকাল বলতে কিছু নেই, ফোক এখনও আছে। কিন্তু ইউরোপে ফোক শেষ হতে চলেছে। সেখানে নতুন কোনো ফোক হবে না, হলে তা হবে পপ কালচার। ভারতবর্ষের আদিবাসীরা এখনও আছে, যদিও কোণঠাসা হয়েছে তারা। এ দেশের উপজাতীয় বসতির আদি পাঁচ হাজার বছর কিংবা তারও বেশি। আর্যরা এখানে আসার পূর্বেও এরা ছিল। তেমনি দ্রাবিড়রাও। তাদের গ্রাম অতি পুরাতন।

অনার্য প্রভাব

আমাদের সভ্যতায় আর্যদের প্রভাব বেশি হলেও সার্বিক নয়। অনার্য প্রভাবও দৃঢ়মূল। বিভিন্ন শব্দের মধ্যে, যেমন হাগা, তা পরিস্ফুট। অথবা আমাদের বাড়ীর ডাক নামগুলো লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কত অনার্য শব্দ আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। অনার্যরা আসার পরও নানা সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে, যেমন পারস্য সংস্কৃতির। আজ এই যে আমরা পায়জামা বা পাঞ্জাবী পরি তা পারসীয়। এটা থেকেই যাবে, কারণ জীবনের সঙ্গে এগুলি মিশে গেছে। লোকসংস্কৃতির মধ্যে অসংখ্য উপাদান—কিছু সংস্কৃত থেকে পাওয়া, আর্যদের থেকেও কিছু এসেছে। অনার্যদের বহু জিনিস থেকে গেছে। বাংলা, ওড়িশা, এই দিকটায় ত মুণ্ডা সাঁওতালরাই ছিল। আর্যীকরণ খুব বেশি হলেও গভীরে যায়নি। কুঞ্জবিহারী দাস ওড়িশার কবি। ওড়িশার আদিবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই অঞ্চলে নরখাদক উপজাতি, ভাই বোনে বিবাহ এইসব ছিল, এখনও তার স্মৃতি রয়ে গেছে। ওড়িয়া লোকসাহিত্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের রূপকথার কথা ধরা যেতে পারে, অথবা ছড়া গান। এগুলি এক

সময়ে খুবই অশ্লীল ছিল। এখনও এটা দেখা যাবে উত্তর ভারতে হোলির সময়ে যে সব গান গাওয়া হয় তা মন দিয়ে শুনলে। লোকমানসে সবই raw আকারে থেকে গেছে। সুন্দর, কুৎসিত, ভালোমন্দ সবকিছু।

বর্তমান প্রবণতা

ক্লাসিকাল হিসেবে যা স্বীকৃত তা বোধহয় টিঁকে গেছে। ওগুলি থাকবে। কিন্তু বর্তমান যুগে আর ক্লাসিকাল সাহিত্য হবে কি না সন্দেহ। এখন যা চলছে তা পপ কালচার। এর মূল্য অন্যত্র, একে সংস্কৃতি বলা যাবে কি না সন্দেহ। এর কিছুই বেশিদিন টেঁকে না। যেমন ফিল্ম, কিছু ফিল্ম হয়ত উতরে গেছে, কিন্তু বেশিরভাগ ছবি ও গান পপ কালচার ছাড়া কিছু নয়। এটা কোনোদিনই ক্লাসিকালের মর্যাদা পাবে না। অথবা এখন যে সব যাত্রা চলছে। কী বিষয়বস্তু নিয়ে? কার্ল মার্কস, হোচিমিন, হিটলার এসব নিয়ে। এসব কে বুঝবে? এর সাময়িক মূল্য আছে। যাত্রাতে প্রাচীন কালের আভাস শেষ হয়েছে।

গান্ধীজীর কৃপায়, চরণ সিংদের জন্য গ্রামের দিকে নজর দেওয়ার কথা হচ্ছে। এমনকি সি. পি. এম পর্যন্ত গ্রামের কথা বলছে। শহর যদিও গ্রামকে প্রভাবিত করে, তবু আত্মনির্ভর গ্রামের পরিবেশ রয়েছে। সেজন্য মনে হচ্ছে, গ্রামীণ জীবন হয়ত টিঁকে যাবে। সেটা লোকসংস্কৃতির দিক থেকেও আশার কথা। কিন্তু গ্রাম আর সে গ্রাম নেই। থাকবে না। সিনেমা, রেডিও, এখন আবার টি. ভি. এসবের প্রভাব গ্রামেও এসে পড়েছে। গ্রামেও ফিল্মী গান শোনা যাচ্ছে, বেল বটমস পরছে।

জাতে ওঠা

এখনকার কালচার হচ্ছে বিজ্ঞানকেন্দ্রিক, Science Oriented Culture, এতে ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় সভ্যতার ছাপ, প্রভাব যথেষ্ট। আগে মুসলমান আমলে ফারসী শিখে রাজানুকূল্য লাভ সহজ ছিল। সামাজিক সম্মান হোত। সবাই জাতে ওঠার জন্যও ফারসী শিখত। পরে এল খ্রীস্টধর্ম ও ইংরাজী। ইংরাজী হলো রাজভাষা ও শিক্ষার ভাষা। সবাই সাহেব হওয়ার কম্পিটিশনে নামলেন। এমন হয়ই। কিছুদিন আগে এক মৌলবী সাহেব বলেছিলেন, বীরভূমের বাহিরী গ্রামের আগুরিরাই (উগ্র ক্ষত্রিয়) তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পরিবারের ঐতিহ্য রাখার জন্য তাঁরা ফারসী শেখেন। কুমার-খালি গ্রাম তিলি প্রধান জায়গা। সেখানেও তিলিরা ফারসী শিখতেন লক্ষ্য করেছি। জাতে ওঠার জন্যই হয়ত এরা ফারসী শিখতেন। এখনও বংশগত ধারা বজায় রাখার জন্যই এই ফারসী শেখা।

স্বাধীনতার পর দেখা গেল, যেটা কমার কথা সেটা বাড়ল। সর্বত্র ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল গজিয়ে উঠল। এখনও সেই ধারা সর্বত্র চলছে। চাষীর ঘরের ছেলে শিক্ষা পেয়ে চাকরী চায়। অর্থের প্রয়োজন না হলেও ঐভাবে ভদ্রলোক হওয়ার বাসনা। ইংরেজী-য়ানার ঢেউ এখনও প্রবল। জাতে ওঠার জন্য ইংরাজী জানা চাই-ই। ছেলে না চাইলেও

বাবা চাইছেন ছেলে বা জামাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি. এ. বা ভাল চাকরিজীবী হোক। বাংলাদেশের আন্দোলনের সময়েও দেখা গিয়েছিল, বাঙালী মুসলমানরা আরবী ফারসীর প্রভাব তাড়াতে চান। এখানেও ইংরেজীয়ানার বিরুদ্ধে সেইরকম আওয়াজ উঠেছিল। কিন্তু হিন্দুওয়ালারা যতই চিৎকার করুন, তা হওয়ার নয়। যাঁরা ইংরাজী হঠাতে বলছেন তাঁদের ছেলেমেয়েরাই আবার ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হচ্ছেন বেশি। পৃথিবীর সর্বত্র এই একই অবস্থা। জাপানীরা ত চিরকাল স্বাধীন। সেখানেও তাই হচ্ছে। সেখানে অনেক বই-ই দেখেছিলাম দ্বিভাষিক। এক পৃষ্ঠায় মূল ইংরাজী, অন্য পৃষ্ঠায় জাপানী অনুবাদ। সেখানে এক বাঙালী অধ্যাপকের সাথে দেখা হয়েছিল। বর্মার প্রবাসী বাঙালী। পরে সিঙ্গাপুর হয়ে জাপান আসেন। সেখানে ইংরাজী শিক্ষকতা করে বেশ আছেন। নিজের লেখা ইংরাজী শেখার বইও আছে। দেখা যাচ্ছে, সর্বত্রই এই ধারা চলছে। এটা **Western Oriented Culture,** এতে ইংরাজীর দান অনেকখানি। কাজেই ইংরাজী হঠাতে চাইলেও তা করা যাবে না, এটা সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে।

ইংরাজীর সঙ্গে সন্ধি করতেই হবে। কারণ, বর্তমান সভ্যতা এমন হয়ে উঠেছে যাতে ইচ্ছা করলেই ইংরাজীকে তার আসন থেকে টলানো যাবে না। বর্তমান যুগেই এই **Western Scientific Culture**-এর যুগ। ইংরাজীর একটা নিজস্ব প্রাণ আছে। শক্তি আছে। যা দিয়ে সে একটা জায়গা করে নিয়েছে সারা বিশ্বে। এর সঙ্গে স্বাধীনতার কোনো সম্পর্ক নেই। এই সভ্যতার ঢেউ গ্রামে আরো বেশি যাবে, সঙ্গে যাবে পপ কালচারের যাবতীয় অঙ্গ। সেদিক থেকে লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় জাগে। কয়েক দশক বাদে হয়ত লোকসংস্কৃতি তার আগের সেই আকারে থাকবে না। মিলে মিশে অন্য রূপ পাবে। তখন আর তাকে লোকসংস্কৃতি বলা যাবে কি না সন্দেহ।

ক্লাসিকালের যুগ বোধহয় শেষ। যারা ধ্রুপদ সঙ্গীত গাইতেন তাদের সাধনা ছিল জীবনব্যাপী। রাজানুগ্রহ ছিল। এখন সেই পৃষ্ঠপোষকতা কে করবেন ? পনের মিনিটের রেডিও প্রোগ্রাম করে তারা কি পাবেন ? সাহিত্যের অবস্থাও তাই। প্রকাশক রাজী নন, তিনি দেখবেন বাজারে কাটতি কিসের। কাজেই সিরিয়স লেখা প্রকাশের প্রকাশক নেই। এখনকার সাহিত্যিকরা বেশির ভাগই অন্য উপায়ে রোজগার করেন। জীবনের সময়ের শ্রেষ্ঠ অংশই চাকরীতে যায়, তারপর সাংসারিক দায় আছে। সব চুকিয়ে তবে তো সাহিত্য। আগেকার দিনে রাজারা বা জমিদাররা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঠাকুর বাড়ীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ পুরুষদের কথাই ধরা যাক। জমিদারী থেকে তাঁদের টাকা আসত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এখন ত ক্যাপিটালিস্টদের যুগ, তাদের সে মন নেই, ইচ্ছাও নেই। সাহিত্য শিল্পের চেয়ে এলাকায় জলসা করার জন্য তারা টাকা দেবেন। আর বামপন্থী সরকার যদি আনুকূল্য করেন তবে তা রাজনীতির কথা মনে রেখে করবেন। এখন সবেতেই রাজনীতিই প্রধান বিবেচ্য।

লোকসংস্কৃতির বিপদ

লোকসংস্কৃতির বিপদ হচ্ছে, যেসব জিনিস ছিল সেসব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সংগ্রহ হচ্ছে না। বাংলাদেশে একাডেমী হয়েছে, কাজ হচ্ছে ভাল। সরকার বহু টাকাও খরচ করছেন। কিন্তু এখানে কিছুই হচ্ছে না। টাকা নেই, উদ্যোগ নেই। চট্টগ্রামে ইলিশ মাছ ধরার গান ছিল। এই রকম হাতি ধরার গান, গ্রামের কারিগর শ্রেণীর গান। মেয়েরাও মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে, সেসব খুঁজে সংগ্রহ করে রাখা দরকার। বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতির এইসব উপাদান সংগ্রহ করার জন্য শিক্ষকদের কাজে লাগানো হয়েছে। কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সব সংগ্রহ করেছেন। এইসব তথ্য দিয়ে তাঁরা টাকাও পাচ্ছেন। আমাদের এখানে তেমন কোনো সংগ্রহের কাজ বা গবেষণাও হচ্ছে না। গবেষকের মানসিকতা নেই এখানে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারী দক্ষ গবেষকের অভাব। এদেশে গবেষণার অর্থ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কল্পনা। যেমন রামী চণ্ডীদাসকে নিয়ে কল্পনা। অথবা লালন ফকির, তিনি হিন্দু ছিলেন না মুসলমান! তাঁর দান নিয়ে গবেষণা হচ্ছে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অনেক কিছুই রয়ে গেছে বাংলাদেশে। সরকারী ঝামেলা এ সরকার অনুমতি দেন তা ওদিক থেকে নতুন প্রশ্ন তোলা হয়। অথচ লালন একটা সমন্বয়ী ধারা এনেছেন। তাঁর সবকিছুই এভাবে বিলীন হবে হয়ত। লালনের গানের সংগ্রহ বের হয়েছে। অনেক কষ্টে যা পেয়েছি করেছি। কিন্তু আমি কতটা পারি? অনেক কিছু আছে যার ভাবার্থ আমার কাছেও অজানা।

এভাবেই তো লোকসংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়। বাউলের জন্যও বিশেষ সেল গঠন করা দরকার। বাউল সংগ্রহ করার সময়ে টীকা সমেত করতে হবে। বাউলকে লোকসঙ্গীত বলা যায় কিনা এ নিয়ে দ্বিমত আছে। কারণ, বাউল সেই অর্থে লোকসঙ্গীত নয়, সাধন সঙ্গীত। বাউলের মর্মার্থ বোঝা শক্ত, সেটা বুঝতে হলে নাড়া বাঁধতে হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা রীতি আছে যে বাইরের লোককে বাউলের কথার সব অর্থ বলা হয় না। বাউল সঙ্গীতের ওপর ওপর একটা অর্থ আমরা করতে পারি। মনে হতে পারে যে এটাই সব অর্থ। কিন্তু ওর ভেতরের মর্মবাণী বোঝা দুঃসাধ্য। সেটা বুঝতে হলে ওদের সাথে থাকতে হয়। এজন্যই বাউল সংগ্রহ করা, এ বিষয়ে গবেষণা করা বেশ শক্ত কাজ। এরপর আধুনিক জীবনের চাপে বাউল কোণঠাসা হয়ে পড়লে হয়ত এর অনেক কিছুই লুপ্ত হবে। সেজন্য চাই বাউল গবেষণার কেন্দ্র। এখন যেসব কাগুজে ইনস্টিট্যুট আছে তাদের দিয়ে একাজ হবে না।

ভবিষ্যতের ছবি

লোকসংস্কৃতির চর্চা আমাদের দেশে হচ্ছে না তেমন। সরকার কিছু করবেন না। সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থ ছাড়া কতটা কী করা যাবে বলা মুশকিল। বেসরকারী স্তরেও যারা টাকা দিতে পারে তারা দেবে না, কারণ ব্যবসায়ীরা, ক্যাপিটালিস্টরা এসবে উৎসাহী নন। রাজনৈতিক স্বার্থ আছে, পারটির পৃষ্ঠপোষকতা আছে এমন ক্ষেত্রেই তারা টাকা দেবে। তবু সাধ্যমত

লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। বেশি দেরী করলে অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে।

ক্লাসিকাল যেসব সৃষ্টি তা টিঁকে গেছে, আগামী দিনেও টিঁকে থাকবে। শাশ্বত সৃষ্টি হিসেবেই আগামী যুগের মানুষের কাছে ঐসব সৃষ্টি আদরণীয় হয়ে থাকবে। লোক-সংস্কৃতিও থাকবে। লোকসংস্কৃতির প্রতি আমি আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাশীল। সময় থাকতে এর সাথে মিটমাট করা ভাল। মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কোল, ভিল এদের বাদ দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। এরা সমাজের এক বিরাট অংশ, সুতরাং এদের সংস্কৃতি রক্ষা করার দায়িত্ব আছে আমাদের। অন্যদিকে পপ কালচার তো আছেই।

এই সব কিছু মিলিয়ে এক সামগ্রিক কালচার আসছে। সব নিয়ে সংস্কৃতির চতুরঙ্গ। ট্রাডিশনাল, মডার্ন, ফোক ও পপ কালচার এই চারটি ধারা মিলিয়ে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের চেষ্টা চলছে। ভবিষ্যতে **cultured man** বলতে হয়ত বোঝাবে এমন এক মানুষকে যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে: পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, হিন্দী সিনেমা দেখেন, কী বই পড়েন? ডিটেকটিভ নভেল। কিন্তু এটাও বর্তমান জীবনের খণ্ড দিক। রাজনীতির সর্বগ্রাসী ব্যাপার ছাড়াও 'সম্পূর্ণ মানুষের' একটা দিক আছে। সেই মানুষ এত সব কিছুতেও সন্তুষ্ট থাকবে না, সার্থক বোধ করবে না। নানা ধারা মিলেমিশে আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তার এই চতুরঙ্গ প্রবহমান থাকবে।

ভারতবর্ষের মানচিত্র সাঁইত্রিশ বছর আগে যেরকম ছিল এখন সেরকম নয়। এখন দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান কার্যত মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। আরব, ইরানের সঙ্গেই তার যোগাযোগ বেশি, স্বাধীন ভারতের সঙ্গে কম। যুগের বিচারে সে মধ্যযুগে অবস্থিত। ইসলামী রাষ্ট্র হওয়াই তার লক্ষ্য। ইসলামের আদিযুগের অনুবর্তনে।

ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে মানচিত্রের পরিবর্তন বহুবার ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও তার সঙ্গে তাল রেখেছে। সামাজিক পরিবর্তনও। ধর্মীয় পরিবর্তনও। এমনও দেখা গেছে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ইরান, আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গেই নিকটতর সম্বন্ধ, উত্তর ভারতের সঙ্গে দূরতর, উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে একেবারেই না। দক্ষিণ ভারতের তো কথাই নেই। তেমনি, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের তিব্বত, চীন ও বর্মার সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধ, উত্তর ভারতের সঙ্গে দূরতর, উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে একেবারেই না। দক্ষিণ ভারতের তো কথাই নেই। মহাদেশতুল্য এই বিশাল ভূখণ্ডকে একই সম্রাটের অধীনে আনতে প্রথম চেষ্টা করেছিলেন মৌর্যরা, তাঁদের পরে গুপ্তরা, আরও পরে মোগলরা, সর্বশেষে ইংরেজরা। কিন্তু কেউ বরাবরের জন্যে নয়। ইংরেজ ছাড়া আর কেউ পুরোপুরিও নয়।

আর্য বলে যাঁদের চিহ্নিত করা হয় তাঁরা একটি ভাষাগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী নন। সুবিধার খাতিরে আমরা আর্যভাষাকে সংক্ষেপে বলি আর্য। এঁরা যে একই শতাব্দীতে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন তাও নয়। এঁদের মধ্যে একতাও ছিল কিনা সন্দেহ। তবে একটা বিষয়ে এঁরা এক ছিলেন। কালা আদমীকে মেরে কেটে বনবাসে পাঠাতে হবে। কিংবা দাস বানাতে হবে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় তেমনি এখানেও কালক্রমে মিশ্র বর্ণেরও উদ্ভব হয়। তারাই হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের ভাষা হয়তো আর্যভাষা বা তদ্ভব বা তৎসম, কিন্তু বহু পরিমাণে দ্রাবিড় মিশাল, কিরাত মিশাল, নিষাদ মিশাল। অপরপক্ষের সঙ্গেও আর্য মিশাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও হয় আর্য অনার্য মিশাল, সমাজও হয় তাই, ধর্মও হয় তাই।

ধর্ম বলতে কেবল বৈদিক ধর্ম নয়, বেদবিরোধী যজ্ঞবিরোধী ব্রাহ্মণবিরোধী বৌদ্ধধর্মও বোঝায়, জৈন ধর্মও বোঝায়। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে আবেস্তার ধর্মের যথেষ্ট মিল আছে। ইরানীরাও নিজেদের আর্য বলে দাবি করে। গ্রীকরাও যে ভাষায় কথা বলে সেটাও আর্য ভাষা। আবার এটাও লক্ষণীয় যে বৈদিক না হলেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও আর্যভাষী। জৈন ধর্মাবলম্বীরাও তাই। ধর্মগত বিভেদ চর্মগত নয়, ভাষাগত নয়। সমাজ মোটের ওপর একটাই ছিল। সামাজিক আদানপ্রদানে বাধা ছিল না।

আর্যমিশ্র ভারতই পরে হিন্দুস্থান বলে চিহ্নিত হয়। অধিবাসীরা বৈদিক বৌদ্ধ জৈন নির্বিশেষে হিন্দু। বাইরে থেকে যেসব শক হূন গ্রীক আসে, তারা কালক্রমে হিন্দু সমাজের ভিতরেই এক একটা জাত বা কাস্ট বনে যায়, পরে আদান প্রদান সূত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণভুক্ত হয়। গোড়ায় ছিল যবন বা বিদেশী। পরে আর যবন নয়, শকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বা রাজপুত। গোড়ায় অনাচারী বলে ম্লেচ্ছ, পরে সদাচারী হলে ম্লেচ্ছ নয়। হিন্দুরাও অবাধে সমুদ্রযাত্রা করত, ধর্মপ্রচার করত, বৌদ্ধমন্দির বা শিবমন্দির বা বিষ্ণু-মন্দির স্থাপন করত। সেই সূত্রে ইন্দোনেশিয়ার লোক হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ করে। বোরো-বুদর নির্মিত হয়। তারা কাম্বোডিয়া ও থাইল্যাণ্ডেও যায়। সেই সূত্রে আংকোর বাট নির্মিত হয়। অবাধে পর্বত অতিক্রম করে তিব্বতে তথা মধ্য এশিয়ায়ও যায়। প্রধানত বাণিজ্যসূত্রে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার সূত্রে। সেখান থেকে যায় মঙ্গোলিয়ায়, কোরিয়ায়, চীনে ও জাপানে। জাপানে এখনও বৌদ্ধদের প্রভাব।

ইতিহাস আলোচনা করে আমরা পাচ্ছি ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বিভিন্ন অংশের যত না যোগাযোগ বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ তার চেয়ে কম নয়। দুটি স্রোতই চার হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়েছে। একটি বহির্মুখী, অপরটি অভ্যন্তরমুখী। আমরা সবাই ভারতীয় বা হিন্দু এই বোধটা জন্মাতে অন্তত দু-হাজার বছর লেগেছে। একে সব-চেয়ে বেশি সাহায্য করেছে সংস্কৃত ভাষা। দক্ষিণের ভাষাগুলি যদিও উত্তরের ভাষা-গোষ্ঠীর সামিল নয়, তবু সংস্কৃতকেই যোগাযোগের ভাষা করেছে। উত্তর ভারতের রাজারা অস্ত্রবলে দক্ষিণের রাজাদের পরাস্ত করতে পারেননি, কিন্তু ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র বলে তাঁদের বশীভূত করেছেন। যেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ব্যর্থ সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বা জৈন মুনিরা সফল। বৃহত্তর অর্থে হিন্দু তাঁদের প্রজারাও হয়। রামায়ণ মহাভারত উত্তর দক্ষিণের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ থেকেই উত্তর বিজয় আরম্ভ হয়। বিজেতারা শঙ্করাচার্য ও রামানুজ।

ভারতীয় সংস্কৃতির সংহতি মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন সময় দুটি গুরুতর পরি-বর্তন ঘটে। বাইরে থেকে তুর্ক বা আফগান এসে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করে, কিন্তু শক হূনদের মতো হিন্দু বনে যায় না। তাদের ধর্ম ইসলাম, নামকরণ আরবী, সংস্কৃতি পারসিক, নিবিড় সম্পর্ক মধ্য এশিয়ার সঙ্গে। মোগলরা যখন আসে তখনও তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে। তাদের প্রথম তিন সম্রাটের ইতিহাস মঙ্গোলিয়ার ইতি-হাসের সামিল। এটা আমি শুনেছি এক রুশ পণ্ডিতের মুখে। তুর্ক ও মোগলের বংশধর-দের মিলিত নাম হয় মুসলমান। ধর্মান্তরিত হিন্দুরাও সেই নামে পরিচয় দেয়। মুসলমান বলে যে সমাজ সৃষ্টি হয় সে সমাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিজের অতীতকে খুঁজে পায় না, পায় ইসলামের ইতিহাসে। যার শুরু খ্রীস্টোত্তর ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ইরানের ইতিহাস তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। ভারতের ইতিহাসও তেমনি। ইরানীরা এক ধার থেকে মুসলমান হয়ে গিয়ে সংঘর্ষ এড়ায়। ব্যতিক্রম জরথুস্ত্র পন্থীরা। তারা পালিয়ে আসে ভারতে। কিন্তু হিন্দু হয় না। ভারতের লোক যদি একধার থেকে মুসলমান হতো তাহলে এদেশেও সংঘর্ষ হতো না। কিন্তু সাতশো বছর পরেও দেখা গেল অধিকাংশ লোক ইসলাম

গ্রহণ করেনি, মধ্যপ্রাচ্যের ভাষা বা সংস্কৃতির আমলে আসেনি। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যাপারে ফার্সীকে মেনে নিয়েছে ও সেইসূত্রে কতক পরিমাণে পারসিক ভাবাপন্ন হয়েছে। অভিজাতকুল তুর্ক মোগল এলাকার বাইরেও পারসিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত। হিন্দু ও শিখরাজাদের পোশাকআশাক রাজভাষা ইত্যাদি বাদশাহ ও সুলতানদের মতো। সে পোশাক তো স্বাধীনতার পরেও বিশিষ্ট ভারতীয়দের অঙ্গে। দৃষ্টান্ত জওহরলাল নেহরু। যে ভাষায় তিনি কথা বলতেন সে ভাষাও উর্দু। মোগলাই খানা তো আমাদের ঘরে ঘরে। ভাষার মধ্যেও আরবী ফার্সীর অংশ বড় কম নয়। বিশেষত জমিজমা সংক্রান্ত ভাষার। মামলা মোকদ্দমা তো আইন আদালত ছাড়া হয় না। উকিল মোক্তার বিনা।

দ্বিতীয় পরিবর্তনটি ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের বিদায়। কিন্তু অন্যান্য দেশ থেকে নয়। এক হাজার বছর আগে থেকেই সে ধর্ম এশিয়ার অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে শিকড় গজিয়েছে। পরবর্তী হাজার বছরে সে দৃঢ়মূল হয়েছে। এখনও সে জীবন্ত। ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বৃহৎ তার অধিকৃত ভূভাগ। বুদ্ধের যে কী মহিমা তা আমি জাপানে প্রত্যক্ষ করে এসেছি। বৌদ্ধধর্ম আদৌ একটি পতনোন্মুখ ধর্ম নয়। তার পতন যদি তার জন্মভূমিতে ঘটে থাকে তবে সেটা বুদ্ধের বা ধর্মের দোষে নয়, সঙ্ঘের দোষে। জাপানের ইতিহাসে দেখা যায় বৌদ্ধদের সঙ্ঘ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে রাজশক্তির শরিক হয়েছে। শিন্তোরা এটা সহ্য করবে কেন? ক্ষমতা যখন মেইজি সম্রাটের নিজ হস্তে আসে তিনি বৌদ্ধদের হটিয়ে শিন্তোদের রাজ অনুগ্রহ বিতরণ করেন। শিন্তো ধর্মই হয় রাজধর্ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর শিন্তোদেরও হটানো হয়, কিন্তু বৌদ্ধদের তাদের জায়গায় বসান হয় না। জাপান এখন ধর্মনিরপেক্ষ। খ্রীস্টানদেরও সেখানে যথেষ্ট প্রভাব। একটি বৌদ্ধ পরিবারে আমি নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ পাই। কিন্তু পরিবার বলতে যদি গৃহিণী বোঝায় তবে তা খ্রীস্টানই বা নয় কেন? ভদ্রমহিলা জাপানী ভিন্ন অন্য কোনও ভাষা জানেন না। খ্রীস্ট ধর্মের সঙ্গে ইংরেজী ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই। বাইবেল দেখতে চাইলে জাপানী বাইবেল নিয়ে আসেন। তাঁর পিতাও ছিলেন খ্রীস্টান। বোধহয় সেনাপতি বা সেইরকম কিছু। জাপান একদা ক্যাথলিক মিশনারিদের বহিষ্কার করেছিল, অত্যাচারও করেছিল দীক্ষিত খ্রীস্টানদের উপরে। তাঁরা নাকি তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের রাজদ্রোহী হতে ও রাজ্য অধিকার করতে শেখাতেন। যেমন ফিলিপিনসে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজ্যের চেয়ে বাণিজ্যই হয় প্রধান অভীষ্ট। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিদেশীরা জাপানের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন না। যুদ্ধ যখন বাধে তখন সেটা ধর্মযুদ্ধ নয়।

ভারতেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অশোকের আমল থেকেই তাঁদের রাজানুগ্রহ লাভ। কনিষ্কও বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের জন্যে অশোকের পর কনিষ্কই সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ছিলেন। হর্ষবর্ধনও ছিলেন বৌদ্ধ, ধর্মপালও ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু পালবংশের পতনের পর রাজ-শক্তির সঙ্গে বৌদ্ধ সঙ্ঘের বিচ্ছেদ ঘটে। রাজশক্তি চলে যায় বহুস্থলে বৈদিক হিন্দুদের হাতে, বহুস্থলে মুসলিম তুর্কদের হাতে। বৌদ্ধ রাজ্য বলতে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা সিকিমে, ভুটানে, পার্বত্য চট্টগ্রামে। সম্প্রদায়ও ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়। উল্লেখ করা

আবশ্যক যে বৌদ্ধধর্মের আদি রূপও ক্রমে ক্রমে বদলে যায়। তথাকথিত হীনযানের পর মহাযানের উদ্ভব। তারপরে বজ্রযান প্রভৃতি আরও কয়েকটি যানের। এদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অন্তহীন দলাদলি। প্রত্যেকেরই নিজস্ব এক সঙ্ঘ। সঙ্ঘের সকলেই সন্ন্যাসী। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। হাজার হাজার সন্ন্যাসীকে যারা খোরাক যোগাবে তারা হয় গরীব গৃহস্থ, নয় বড়লোক বণিক বা ভূম্যধিকারী, নয় রাষ্ট্র। এঁদের সাধ্য অপরিমিত নয়। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল মঠবাড়ী নির্মাণ করে তার সম্পত্তি থেকে আয়ের উপর নির্ভরশীলতা। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্তদের মধ্যেও একই প্রবণতা। একবার মঠবাড়ীতে ঢুকতে পারলে সারাজীবনের অন্নসংস্থান। সেখানে থাকে না কেবল নারীসঙ্গ। সেটাও নানাসূত্রে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবী, ভৈরবী, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর সংখ্যাও তো কম নয়।

সম্পত্তির লোভে মানুষ কী না করে। মঠবাড়ী গ্রাস করলে যদি অঢেল সম্পত্তি আত্মসাৎ করা যায় যারা বৌদ্ধ নয় তারা এ কর্ম করবে না কেন? এর জন্য ইসলামের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে যাবে কেন? বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার অজাতশক্রর এই ঘোষণা বৌদ্ধদের উচ্ছেদ করবারও ঘোষণা। তখনকার দিনে বাংলাদেশ ছিল আর্যাবর্তের বাইরে। দক্ষিণও ছিল তাই। বৌদ্ধরা এইসব বেদবর্জিত ভূখণ্ডে আশ্রয় নেয়। আর পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে। সেসব অঞ্চল থেকে আর্যভাষীরা অপসারণ করেছিলেন। বৌদ্ধ প্রভাবিত বাংলাদেশ মুসলিম প্রভাবিত হতে হতে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। বৌদ্ধ প্রভাবিত উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত মুসলিম প্রভাবিত হতে হতে পশ্চিম পাকিস্তানে বিবর্তিত হয়। তবে দক্ষিণটা মুসলিম বিজেতারা পুরোপুরি জয় করতে পারেন না, তাই বৌদ্ধ প্রভাবের শূন্যতা পূরণ করে যাকে এককথায় বলা হয় নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এ ধর্মে বৈদিক আর্যদের যাগযজ্ঞ অশ্বমেধ গোমেধ ছিল না। গোমাতা এদের প্রত্যক্ষ দেবতা। বিষ্ণু, শিব, চামুণ্ডা প্রভৃতির সাকার পূজার প্রচলন হয়। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা প্রভৃতির নিরাকার উপাসনার। নেতৃত্ব করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা। তাঁদের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ পিতামাতার সন্তান। স্ববর্ণপোষণ তাঁদের পবিত্র কর্তব্য। তাঁদের গদীতে যাঁরা মোহন্ত হন তাঁরাও জাত ব্রাহ্মণ। আজ পর্যন্ত।

ইসলামের আগমনের পর এই নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের অজাতশক্রদেরও শক্র জোটে। এঁদের মন্দিরগুলিরও বিপুল সম্পত্তি ছিল। দেবমূর্তির বাইরে ও ভিতরে বহুমূল্য মণিমুক্তা। গজনীর মাহমুদ প্রভৃতির দিগ্বিজয়ের লক্ষ্য ছিল মন্দিরের, মঠবাড়ীর, দেবমূর্তির সম্পত্তিগ্রাস, সম্পদগ্রাস। তবে তুর্ক ও মোগলরা যখন এই দেশেই থেকে যান তখন সম্পত্তি বা সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবেন কোথায় ও কেন? ইসলাম এমন এক ধর্ম যাতে রাজাও নেই, পুরোহিতও নেই, সুতরাং রাজতন্ত্রও স্বীকৃত নয়, পুরোহিততন্ত্রও স্বীকৃত নয়। এসব পরবর্তীকালের বিচ্যুতি। এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই যে রাজপুত্রই রাজা হবেন, আর তাঁরও হওয়া চাই প্রথম জীবিত কুমার। একই কথা পুরোহিতকুলের বেলাও। ইসলামের ইতিহাসে রাজার উত্তরাধিকারী নিয়ে, ইমামের উত্তরাধিকারী নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তি হয় গায়ের জোরে। আওরঙ্গজেবের গায়ের জোর ছিল, দারা শিকোর ছিল না। থাকলে তিনিও গায়ের জোরেই বাদশাহ হতেন, **Primogeniture** নিয়ম মতে

নয়। তাঁর পিতাও গায়ের জোরে সিংহাসন পেয়েছিলেন। প্রেমিক হিসাবে শাহজাহান অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা খসরুর নিধনও তাঁরই আদেশে হয়।

মুসলিম সুলতান ও বাদশাহরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে না পেরে হিন্দুদের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন। লুটপাটের চেয়ে খাজনা আদায়ই শ্রেয়। সেটা হিন্দুরাই ভাল পারে। শান্তিতে রাজত্ব করতে হলে যুদ্ধবিগ্রহও রোজ রোজ করা যায় না। মুসলিম শাসকদের অনেকেই হিন্দু প্রজাদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। কার্যকুশল হিন্দুদের জায়গা জমি লাখে-রাজ দিতেন। সংস্কৃতির দিক থেকেও সমঝোতা হয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, উর্দু মুশায়েরা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ভালবাসে। উর্দু ভাষা হয় বহু হিন্দু পরিবারের মাতৃ-ভাষা। উর্দু সাহিত্য হিন্দুদের দানে ভরপুর। সমঝোতা হয় ধর্মের সঙ্গে ধর্মেরও। নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির শিষ্যদের মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সুফী মতবাদ হিন্দুদেরও আকর্ষণ করে। পীরদের মুরিদ হন হিন্দুরাও। কিন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করেন না। করতে হয় না। সহঅবস্থানই হয়ে দাঁড়ায় সর্বস্বীকৃত নীতি। হিন্দু, মুসলিম, শিখ রাজারা এটা মেনে নেন।

ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকটাও ছিল ইউরোপীয় ইতিহাসের অঙ্গ। সমসাময়িক ইউরোপীয় ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে না নিলে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারা শক্ত। ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হয় আধুনিক যুগ। ভারতবর্ষ নতুন করে পরাধীন হয়, সেটা সত্য। কিন্তু এটাও সত্য যে ভারতবর্ষ একই কালে মধ্যযুগের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়। দেশের আলোকপ্রাপ্ত অংশ এই মুক্তির স্বাদ পেয়ে নবলব্ধ জ্ঞানের আলোয় সবকিছুকে পরীক্ষা করে। প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও সমাজ ও সংস্কৃতি কী পরিমাণে সনাতন, কী পরিমাণে পুরাতন, কী পরিমাণে সংস্কারযোগ্য, কী পরিমাণে বর্জনযোগ্য, কী পরিমাণে রক্ষণযোগ্য। ইংরেজরা চিন্তার স্বাধীনতায়, প্রকাশের স্বাধীনতায় অভ্যস্ত। তারা রাজ-দ্রোহের গন্ধ না পেলে বাধা দেয় না। বাধা যেটা আসে সেটা স্বদেশেরই অন্ধকার অংশ থেকে। শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ ক্রমে তৃতীয়ার চাঁদ হয়, তৃতীয়ার চাঁদ ক্রমে চতুর্থীর চাঁদ হয়, এমন সময় ওঠে আর্তরব। গেল, গেল, হিন্দু ধর্ম গেল, হিন্দু সমাজ গেল, হিন্দু সংস্কৃতি গেল, ইসলাম ধর্ম গেল, মুসলিম সমাজ গেল, মুসলিম সংস্কৃতি গেল। আমাদের সবকিছুই তো সনাতন, অপরিবর্তনীয়, অবর্জনীয়, অসংস্কারযোগ্য। এটাই হল সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমি। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু তার থেকে আসে স্বদেশী মনোভাব, দেশ আর ধর্ম একাকার হয়ে যায়, ধর্ম আর সংস্কৃতি আগেও একাকার ছিল, এখন হয় আরও বেশি একাকার। তবে মুসলমানদের বেলা দেশ বলতে বোঝায় ভারতবর্ষ নয়, ইসলামী দুনিয়া, যার একাংশ ভারত। অতখানি প্যান-ইসলামিজম মোগল আমলেও ছিল না। বৌদ্ধরা যখন ছিল তখন অতখানি হিন্দুয়ানীও কি ছিল? এটাও একপ্রকার প্যান-হিন্দুইজম, যার বক্তব্য 'বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া আর কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার।' বলা বাহুল্য, তিনি হবেন হিন্দু রাজা। যেমন রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। তার জন্যে যদি ত্রেতাযুগে প্রত্যাবর্তন করতে হয় সেই শ্রেয়। রিভাইভালিজম হিন্দুদের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির প্রেরণা যোগায়। তা বলে সে মোগল শাসনে ফিরে যেতে

চায় না। মুসলিম রিভাইভালিস্টরা কিন্তু মোগল শাসনেই ফিরে যেতে উদ্গ্রীব। সেখান থেকে উজিয়ে চার খলিফার শাসনে। চার খলিফার শাসনই ছিল চিরন্তন আদর্শ। তার থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে বলেই না বিশ্ব মুসলিমদের নিঃস্ব দশা।

ইউরোপের ইতিহাসের আওতা থেকে বেরিয়ে আসা মানে এশিয়ার ইতিহাসের সামিল হওয়া। আমরা জাপানের দিকে তাকাই। ওকাকুরা আসেন প্রাচ্য সংস্কৃতির আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিতে। কুমারস্বামী আসেন প্রাচীন ভারতের শিল্পসৌকর্য পুনরুদ্ধার করতে। আমাদের চিন্তানায়কদের মনে দারুণ দোটানা, এক হাত ধরে টানে প্রাচীন ভারত, আরেক হাত ধরে আধুনিক ইউরোপ। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপকে মেলান যায় কী করে? মেলাতে না পারলে কি প্রাচীনের মায়া কাটাতে হবে? না আধুনিকের মোহ? ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মতো একপ্রকার প্রাচ্য রেনেসাঁস ঘটেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালীদের মনোজীবনে। সেটা পুরোপুরি ইটালী বা ফ্রান্স বা ব্রিটেনের মতো নয়। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব। প্রকাশ্য স্বদেশিয়ানা ও প্রচ্ছন্ন হিন্দুয়ানার দাপটে তা গতিবেগ হারায়। আমাদের সাধনা যেন ইউনিভার্সাল হওয়ার নয়, ওরিয়েণ্টাল হওয়ার।

পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মূল কথাটা কী? মানুষও ইচ্ছা করলে ও সাধনা করলে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হতে পারে। বিশ্বামিত্রের মতো নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। সর্বগুণের সম্ভাব্যতা তার ভিতরেই নিহিত রয়েছে। সে স্বর্গে যেতে চাইবেই বা কেন? স্বর্গ তো সে এই মর্ত্যভূমিতেই গড়ে তুলতে পারে। এর জন্যে একজন স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরেরই বা কী দরকার? খ্রীস্টধর্ম এসে গ্রীক, রোমান, টিউটনিক দেবদেবীদের বিদায় দিয়েছে। তাতে মানুষের কী ক্ষতি হয়েছে? তেমনি ঈশ্বরকেও বিদায় দিলে ক্ষতি কী? ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও এ জগতের সর্বরহস্য ভেদ করা যায়। যা দিয়ে তা করা যায় তার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে তাল রেখে দর্শনও চলবে। সাহিত্যও চলবে। স্থাপত্যও চলবে। কারিগরি শিল্পও চলবে।

মুশকিল হচ্ছে, বিজ্ঞানের কল্যাণে আর একটা গথিক ক্যাথিড্রালও হয় না, আর একটা তাজমহলও হয় না, আর একটা কোণার্কের মন্দিরও হয় না। হয় না অজন্তার গুহাচিত্র, মাইলো দ্বীপের ভীনাস, তানসেনের ধ্রুপদ সংগীত। হয় না ভরতনাট্যম, রুশ দেশের ব্যালে, প্রাচীন গ্রীসের নাটক। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মানবিকবাদ যদি কেবলমাত্র বিজ্ঞাননির্ভর হত তবে তা একপেশে হত। বিজ্ঞানের মতো আরও একটা পাশ হচ্ছে আর্ট। তার নিয়মকানুন অন্যরকম। আর্ট নিয়ে যাঁরা থাকেন তাঁদের চাই অন্তরের প্রেরণা। সেটা আসতে পারে ভগবৎ প্রেম থেকে, মানব প্রেম থেকে, নারীর প্রেম থেকে, দেশের প্রেম থেকে। প্রেমের সঙ্গে রয়েছে সৌন্দর্য-সৃষ্টি। অসুন্দরের মধ্যেও তাঁরা সুন্দরকে দেখেন। ধার্মিক না হলেও তাঁদের চলে। কিন্তু রসিক না হলে চলে না। তাঁরা রসে অন্তমগ্ন থাকেন।

রেনেসাঁস একপেশে নয়। কারণ মানুষ একপেশে নয়। বিজ্ঞান চর্চা থেকে যেমন শিল্পবিপ্লব আসে তেমনি দর্শন চর্চা ও নীতি চর্চা থেকে ফরাসী বিপ্লব। আধুনিক মানুষ

পারলৌকিক মুক্তির কথা ছেড়ে ইহলৌকিক মুক্তির কথা ভাবে। রাজতন্ত্রের অধীনতা থেকে মুক্তি, পুরোহিততন্ত্রের অধীনতা থেকে মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদীর অধীনতা থেকে মুক্তি, ক্রীতদাসের মালিকদের অধীনতা থেকে মুক্তি, কলামাত্রের কৃত্রিম বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি। এককথায় সার্বিক মুক্তি। লিবার্টি। যাদের লিবার্টি যথেষ্ট নয়, তারা চায় ইকুয়ালিটি। সাম্য। শ্রেণী সাম্য, জাতি সাম্য, বর্ণ সাম্য, নরনারী সাম্য, দেশ বিদেশ সাম্য। এও যথেষ্ট নয়। চাই মৈত্রী। ফ্র্যাটারনিটি। দুই শতাব্দী ধরে এই ট্রিনিটির আরাধনা চলেছে। কোথাও যুদ্ধ, কোথাও বিদ্রোহ, কোথাও বিপ্লব ঘটেছে। সাধারণত সহিংস, কিন্তু কোনও কোনও দেশে অহিংস। ভারতবর্ষও তেমনি এক দেশ। কিন্তু একমাত্র নয়। প্যাসিভ রেজিস্টান্সের দৃষ্টান্ত টলস্টয় তাঁর স্বদেশের জনগণের মধ্যে পেয়েছেন, বিশেষ করে দুখোবরদের মধ্যে। সেটা ইংল্যাণ্ডের কোয়েকারদেরও ঐতিহ্য। সে দেশের মহিলারা সেই উপায়ে ভোট দেবার অধিকার আদায় করেন। সাম্যবাদ চিন্তা থেকে এসেছে মার্কসবাদ, নৈরাজ্যবাদ, হরেক প্রকার সমাজতন্ত্রবাদ। মৈত্রী চিন্তা থেকে এসেছে শান্তিবাদ, লীগ অব নেশনস্‌, ইউনাইটেড নেশনস্‌। বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের কল্পনা। পারমাণবিক মারণাস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করার জল্পনা। অভূতপূর্ব নারী জাগরণ ঘটেছে। আর অভূতপূর্ব শূদ্র জাগরণ। শ্রমিক জাগরণ। প্রোলিটারিয়ান জাগরণ। গণজাগরণ। যেখানে বাধা পেয়েছে সেখানে আতিশয্যও ঘটিয়েছে। হেরেও গেছে। মোটের উপর যা হয়েছে তার নাম এককথায় প্রগতি।

রেনেসাঁসের পূর্বে সংস্কৃতির প্রেরণার উৎস ছিল ধর্ম। পরে তার উৎস হয় মানবিক-বাদ। ফরাসী বিপ্লবের পরে মানবিকবাদের বিচিত্র শাখা প্রশাখা দেখা দেয়। রোমান্টি-সিজম, আইডিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম, রিয়ালিজম, ইমপ্রেসনিজম, এক্সপ্রেসনিজম, সুররিয়ালিজম ইত্যাদি। পুরাতন ক্লাসিসিজমও নতুন রূপ নিয়ে ফিরে আসে। সমস্তই মানুষকে আর প্রকৃতিকে নিয়ে। ঈশ্বরকে বা পরলোককে নিয়ে নয়। বিবর্তনতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে মানুষ কল্পনা করে সে ক্রমাগত উন্নতি করতে করতে একদিন অতিমানব হবে। মহামানব তো অতীতেও জন্মেছেন। ভবিষ্যতে জন্মাবে অতিমানব। জাতিকে জাতি। নেশনকে নেশন। সেই অতিমানবের অসাধ্য কিছু থাকবে না। গ্রীক রোমান হিন্দু দেবদেবীর মতো। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কিন্তু গুরুতর গরমিল। জনসংখ্যা কয়েক বছর অন্তর অন্তর ডবল হয়ে যাচ্ছে। পার্টিশনের সময় অখণ্ড ভারতের জনসংখ্যা ছিল চল্লিশ কোটি। এখন খণ্ডিত ভারতেরই জনসংখ্যা আশি কোটির কাছাকাছি। পাকিস্তানের জনসংখ্যা—পার্টিশনের সময় ছিল প্রায় দশ কোটি। এখন তার পূর্বাংশের অর্থাৎ বাংলা-দেশের জনসংখ্যাই প্রায় দশ কোটি। পৃথিবীর সর্বত্র এই জনস্ফীতি লক্ষিত হচ্ছে। তবে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে এই হারে নয়। কিন্তু প্রায় সর্বত্র বনজঙ্গল কেটে বসত হচ্ছে, বনজঙ্গল ধ্বংস হলে বন্যপ্রাণীও ধ্বংস হবে। মৃত্তিকার উর্বরতা কমে যাবে। বন্যার আশঙ্কা বাড়বে। বৃষ্টির অভাব হবে। কলকারখানার ময়লার পরিবেশ দূষণ তো শুরু হয়েছেই। নাগরিক-করণের আতিশয্য থেকে জলাভাব ইত্যাদি অভাব।

তাছাড়া এটাও পরিষ্কার যে কয়লা, পেট্রল ইত্যাদি খনিজ ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে

আসছে। সৌরশক্তি যদি সহায় না হয় তবে শক্তির অভাব হবে। পারমাণবিক শক্তির সদ্‌ব্যবহার না করলে পৃথিবী থেকে প্রাণীমাত্রের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা বৃথা। মানুষ ভগবানের ক্ষমতা হাতে নিয়ে ভগবান হবে না, হবে ডাইনোসরের মতো নির্বংশ। যদি না মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে গ্রহান্তরে পালায়। সেটাই একমাত্র পথ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে মানুষের মনে যে নিশ্চিতি ছিল যুদ্ধের পর তা সংশয়ে ছেয়ে যায়। কিন্তু রুশ বিপ্লবও বহু মানুষের মনে নতুন সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিশ্বাস জাগায়। বিশ্বাসে বলবান হয়ে তাঁরা ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সংগ্রামে নামেন। কিন্তু যে অস্ত্র দিয়ে জয়ী হন তা পারমাণবিক অস্ত্র। তেমন জয় নিয়ে কোনোদিন মহাকাব্য বা এপিক উপন্যাস লেখা হবে না। অশুভ উপায় অবলম্বন করে শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধ নিয়েও কি এখনও তেমন কোনও মহান সৃষ্টি হল? না, রুশ বিপ্লব নিয়েও না। হয়েছিল যেমন নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ নিয়ে। ফরাসী বিপ্লব নিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প সাহিত্য, সঙ্গীতের তুলনায় বিংশ শতাব্দী নিষ্প্রভ। রবীন্দ্রনাথ, বার্নার্ড শ, *প্রুস্ত*, জয়েস, রিলকেও উনবিংশ শতাব্দীর সন্তান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তেমন কোনও বনস্পতির দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। মহাত্মা গান্ধী ও আলবার্ট শোয়াইসারের সঙ্গে সঙ্গে নীতির ধ্রুবতারাদেরও অন্তর্ধান হয়েছে। সংস্কৃতির সহিত নীতিরও গভীর সম্বন্ধ। নতুন মহাভারত লেখা হলে গান্ধীজীকে কেন্দ্র করেই লেখা হবে। নীতির দিক থেকে আমরা এতদূর নেমে গেছি যে অ্যাটেনবরার ফিল্মেরও তাৎপর্য বুঝিনে। যাঁরা পারমাণবিক বিনষ্টির সম্মুখীন তাঁরা কিন্তু বোঝেন। একমাত্র প্রেমই জয় করতে পারে প্রলয়কে। যদি হিংসা প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে ওঠে।

অতি প্রাচীন কালেই মানুষ গুহাচিত্র আঁকত। সংস্কৃতি বলতে চিত্রকলাও বোঝায়। সুতরাং সংস্কৃতির উদ্ভব অতি প্রাচীনকালেই। তেমনি অতি প্রাচীনকালেই মানুষ ঘর বানাতে, আগুন জ্বালাতে ও জমি চাষ করে ফসল ফলাতে শিখেছিল। হাজার সাত আট বছর আগে দুর্গ নির্মাণ ও নগর পত্তন করতেও পেরেছিল। সুতরাং সভ্যতার সূচনাও সুপ্রাচীনকালে। সংস্কৃতি ও সভ্যতা ঠিক একার্থক নয়। সংস্কৃতি যত ব্যাপক সভ্যতা তত ব্যাপক নয়। সংস্কৃতি যত গভীর সভ্যতা তত গভীর নয়।

যদিও সংস্কৃতি তথা সভ্যতার অস্তিত্ব বহু শতাব্দীর তবু অষ্টাদশ শতাব্দীতেই 'কালচার' ও 'সিভিলাইজেশন' নামক শব্দদুটির উৎপত্তি। উনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজী থেকে দ্বিতীয়টিকে বাংলায় তর্জমা করা হয় 'সভ্যতা' বলে। কিন্তু প্রথমটির উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। 'কালচার' ও 'কালটিভেশন' একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। কালচারের ভেতরে কালটিভেশনের ভাব আছে। তাই অনেকেই কালচারের তর্জমা করেন কৃষ্টি বলে। আক্ষরিক অর্থে সেটা ভুল নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর কানে লাগে ও প্রাণে বাজে। 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে তিনি কৃষ্টি শব্দটিকে নিয়ে রঙ্গ করেছেন। মহারাষ্ট্র থেকে পাওয়া যায় কালচার অর্থে সংস্কৃতি। কবিগুরু সেটিকেই বাংলায় ব্যবহার করতে শুরু করে দেন। অর্ধ শতাব্দী পরে সংস্কৃতি এখন সর্বত্র প্রচলিত হয়েছে।

লোকের ধারণা এটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ। এটা অর্ধ-সত্য। বৈদিক যুগে সংস্কৃতি বলতে বোঝাত যজ্ঞ প্রভৃতির প্রস্তুতি। নৃত্য গীত কাব্য ইত্যাদি নয়। 'ব্রাহ্মণ' রচনার যুগে সংস্কৃতি বলতে বোঝাত গঠন। ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃতির অর্থ দেবতার কাছে উৎসর্গ। পরবর্তীকালে শব্দটি অপ্রচলিত হয়ে যায়। হঠাৎ এই বিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজী কালচার শব্দের পারিভাষিক শব্দ রূপে এর নবজন্ম ঘটে। ক্ষতি কী? ক্ষতি এই যে কৃষি আর কৃষ্টি যেমন একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন কৃষি আর সংস্কৃতি তেমন নয়। এর ভিতরে কর্ষণের ভাব নেই। কর্ষণ করলে তবেই জমিতে ফসল ফলে। মনোরাজ্যেও। বীজ থেকে গাছ হয়। কিন্তু সংস্কৃত যেমন প্রাকৃতের রূপান্তর সংস্কৃতিও তেমনি প্রকৃতির রূপান্তর। এর মধ্যে আছে রিফাইনমেনটের ভাব। কিংবা জীর্ণ সংস্কারের ভাব। শ্রুতিমধুর কিন্তু যথাযথ নয়।

যাই হোক, সংস্কৃতিই এখন চলতি শব্দ। কৃষ্টি সাধারণত অচল। কিন্তু এর ফলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অর্থ দাঁড়িয়েছে নাচ, গান, অভিনয় ও আবৃত্তি। বিজ্ঞানের বা দর্শনের বা উচ্চমানের সাহিত্যের জন্যে লোকের আগ্রহ নেই। সেসব হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবদ্ধ। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে আগ্রহও সীমাবদ্ধ। চিত্রকলা পৃষ্ঠপোষকের অভাবে কমার্সিয়াল আর্ট। আর ভাস্কর্য এখনো প্রতিমার পর্যায় অতিক্রম করতে গেলে বাধা পাচ্ছে। আধুনিক মানুষের কালচার এক বিরাট ব্যাপার। কত কী তার মধ্যে পড়ে।

মধ্যযুগের মতো তা ধর্মের আঁচলধরা নয়। অথচ ধর্মকে বর্জন করতেও বাধ্য নয়। যা কিছু মানবিক তথা প্রাকৃতিক তাই ও তার সবটাই সংস্কৃতির অন্তর্গত। ধর্মও তার বাইরে নয়। তাই বলে একান্ত নয়। অপরিহার্যও নয়।

দেবদেবী, স্বর্গনরক, ইহলোক পরলোক, বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতির ধারণা থেকেই ধর্মের উদ্ভব। অতি প্রাচীনকালের গুহাচিত্রের উপর তার কোনো ছাপ না পড়ায় এমন অনুমান অযথা নয় যে মানুষের ধর্মবোধ জন্মায় শিল্পবোধের পরে। মানুষের ইতিহাসে শিল্পই অগ্রজ, ধর্ম তার অনুজ। ধর্মের আসার আগে প্রকৃতিকে নিয়েই শিল্পীরা অনেকদূর এগিয়েছিল। পরবর্তীকালে ধর্মের প্রভাবে অতিপ্রাকৃতকে অবলম্বন করে আরো অনেক-দূর অগ্রসর হয়। বিজ্ঞান এসে অতিপ্রাকৃতকে প্রভাবহীন করেছে। শিল্পের বিষয়বস্তু হয় প্রকৃতি ও মানুষ। কিংবা বিমূর্ত কোনো আইডিয়া।

ধর্ম দাবী করেছিল যে জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগই ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। সে দাবী সংকীর্ণতর হতে হতে এখন কেবল মন্দিরে মসজিদে গির্জাতেই আশ্রয় নিয়েছে। গির্জা একদা শিল্পের মহান পৃষ্ঠপোষক ছিল। এখন আর সে সামর্থ্য নেই। রাজারাজড়ারাও ছিলেন উদার পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা আজকাল প্রায় সব দেশেই রাজ্যহারা। যেখানে রাজ্যহারা নন সেখানে ক্ষমতাহীন। শিল্পীদের নির্ভর করতে হচ্ছে কতকটা ধনিকদের উপরে, অনেকটা মধ্যবিত্তদের উপরে। শ্রমিক কৃষকদের উপর সরাসরি নির্ভর করার দিন এখনো আসেনি। তাদের নামে যেসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের উপর নির্ভর করে ফল যা হয়েছে তা তেমন উচ্চমানের নয়। শিল্পকে সমাজের আঁচলধরা করলে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের পরিসর খর্ব হয়। তবে সমাজের শিল্পবোধ যখন আরো উন্নত হবে তখন শিল্পীকেও আরো স্বাধীনতা দেওয়া হবে। তখন শিল্পসৃষ্টির মান উচ্চাঙ্গের হবে।

শিল্পসৃষ্টির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করলে কেবল যে স্রষ্টার কাছ থেকে তার সেরা সৃষ্টি পাওয়া যায় না তাই নয় ভোক্তাকেও সেরা উপভোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। উভয়ের মাঝখানে ধর্ম বা সমাজ বা রাষ্ট্র যেই দাঁড়াক না কেন সেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অপর পক্ষে সে যা দিতে পারে আর কেউ তা পারে না। একটা বাঁধা আয় সেইদিক থেকেই আসে। স্বাধীনতার মতো সামাজিক নিরাপত্তাও শিল্পীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। এর অভাবে বহু প্রতিভার অপচয় বা অপব্যবহার ঘটে। আবার এর জন্যে অরসিকের মনস্তুষ্টিও কম ক্ষতিকর নয়।

আর সকলের মতো শিল্পীকেও প্রাণধারণ করতে হয়। কিন্তু তার উপরেও একটা কিছু আছে। সেটা রূপের দায় ও রসের দায়। কতক লোককে এই নিয়ে জীবন ভোর করে দিতে হয়। তবেই সকলে পায় রামায়ণ মহাভারত বা মেঘদূত শকুন্তলা বা বৈষ্ণব পদাবলী বা রবীন্দ্রসঙ্গীত। সংস্কৃতির প্রত্যেকটি বিভাগই হচ্ছে প্রাণধারণের উর্ধ্বতন স্তরের ব্যাপার। যে দেশে বা যে যুগে এই উর্ধ্বতন স্তরটির জন্যে কেউ নেই বা থাকলেও তার প্রাণধারণের সংস্থান নেই বা তার গুণের আদর নেই সে দেশে বা সে যুগে সংস্কৃতির বিকাশ নেই। তেমন বন্ধ্যা দেশ বা যুগ বৈষয়িক দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে পারে। কিন্তু

তার বিষয়সম্পত্তি সংস্কৃতির ভার বহন করে না। তার মূল্যই বোঝে না। নিচুদরের গান বাজনা বা নাচ নিয়েই সে সন্তুষ্ট। অথবা আড়ম্বরকেই সৌন্দর্য বলে ভ্রম করে। গুণীজনের সমস্ত শক্তিই যদি প্রাণধারণের কর্মে ব্যয়িত হয় তবে উর্ধ্বতন স্তরের জন্যে যা করণীয় তার জন্যে শক্তি থাকে না।

বারো মাসে তেরো পার্বণও আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্গত। আমার তো মনে হয় এইসব পালপার্বণের উদ্ভব এমন এক স্মরণাতীত যুগে যখন ধর্মেরও উদ্ভব হয়নি। বসন্তের আগমনে মানুষ বসন্ত উৎসব করে। গোড়ায় ছিল এটা ঋতু উৎসব। নরনারী পাগলের মতো পরস্পরের গায়ে রং মাখায়, নাচে, গায়, হল্লা করে। শালীনতা মানে না, একদিনের জন্যে সমাজের বন্ধন শিথিল হয়। প্রাচীন গ্রীসেও এ রকম ছিল। কালক্রমে আমরা আরো সংযত হয়েছি, কিন্তু সর্বত্র নয়। রাজস্থানে হোলিখেলার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা চমকপ্রদ। হিন্দুস্থানীদের অশ্লীল গান তো আমার নিজের কানে শোনা। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেছেন তাঁদের জানা উচিত যে এর মূল অনেক গভীরে নিহিত। মানুষ এখনো প্রিমিটিভ। মাঝে মাঝে সে রক্তপাতের নেশায় মাতে। তার নাম যুদ্ধ। তেমনি এক রক্তপাতকে রঙের খেলায় রূপান্তরিত করে হোলিখেলা। আনুষঙ্গিক অশালীনতাও প্রিমিটিভ ধর্ষণের রূপান্তর। একে আরো সংস্কৃত করতে হবে। সেরূপ চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুষ্ঠিত বসন্ত উৎসবে।

বসন্ত উৎসব শ্রীকৃষ্ণের দোল লীলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এটা হলো পরবর্তীকালের খোদকারী। খ্রীস্টানদের বড়দিনও খ্রীস্টজন্মের পূর্ব থেকেই ছিল। সেটা ছিল এক ঋতু উৎসব। বহুকাল থেকে প্রচলিত। খ্রীস্টজন্মের পর সেটাকে এক ধর্মীয় রূপ দেওয়া হয়। সেই রূপান্তর তাকে সুসংস্কৃত করেছে। গোড়ায় যা ছিল তা অপসংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু পার্বণের আনন্দ তাতেও ষোল আনা ছিল। আর আনন্দই তো উৎসবের প্রাণ।

একজন গবেষকের মুখে শুনেছি ভারতের প্রাচীনতম পার্বণ ছিল শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত-পঞ্চমী। বোধহয় বসন্তকাল শুরু হতো সেকালে শ্রীপঞ্চমী থেকে। তা নিয়ে লোকে আনন্দ করত। পরবর্তী যুগে দেবদেবীদের আবির্ভাব। তাঁদের একজনকে সংযুক্ত করা হয় শ্রীপঞ্চমীর সঙ্গে। তিনি বাগ্‌দেবী হওয়ার আগে ছিলেন জলের দেবী। জলের অন্য নাম সরঃ। সরস্বতী নামটি আরো আগে নদীর নাম ছিল কি না কে জানে? সেই নদীও তো একটি দেবী। যেমন গঙ্গা। দেবী সরস্বতীর অপর নাম শ্রী। তিথিটি তাই শ্রীপঞ্চমী বলেই চিহ্নিত। সরস্বতীপূজা এখন একটি ধর্মীয় উৎসব। কিন্তু অনুমান করার হেতু আছে যে আদিতে ছিল একটি ঋতু উৎসব। সম্ভবত লোকে জলকেলি করত। রাজহংসের মতো। পরে রাজহংসই হয় জলের দেবতার বাহন। জাপানে এক সরস্বতী মূর্তি দেখি। তাঁর হাতে বীণার বদলে কোতো বাদ্য। জাপানে তিনি জলের দেবী। নদীর জলের, পুষ্করিণীর জলের, সমুদ্রের জলের। সেদেশে তাঁর এক জাপানী নাম।

দুর্গাপূজাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন শারদোৎসব। তিনি এর একটা প্রতিমাবর্জিত ও পূজাবর্জিত রূপ দিয়েছিলেন। বসন্ত উৎসবের মতো জনপ্রিয় হয়নি। গোড়ায় সেটিও ছিল একটি ঋতু উৎসব। শরৎকাল সূচনা করে বর্ষাকালের শেষ। বসন্ত যেমন শীতকালের

শেষ। দেবীর সঙ্গে বা পূজার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। এসব পরবর্তী কালের প্রবর্তন। বহু দেশেই একজন মাদার গডেস বা আদি জননীর পূজা প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে তিনিই হন খ্রীস্টানদের যীশুমাতা মেরী। আর হিন্দুদের গণেশজননী দুর্গা। কালক্রমে এটিই পরিণত হয়েছে ভারতের না হোক বাংলার হিন্দুদের সর্বপ্রধান উৎসবে।

এর সঙ্গে পাল্লা দেয় পশ্চিম ভারতের দেওয়ালী আর উত্তরভারতের রামলীলা। দেওয়ালীও খুব সম্ভব ঋতু উৎসব রূপেই আরম্ভ হয়। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় কালীপূজা বা লক্ষ্মীপূজা। যেখানে যে রকম। দেওয়ালী থেকে শুরু পশ্চিম ভারতে নববর্ষ। এর প্রকৃত কারণ প্রাচীন ভারতের কালগণনায় নিহিত। রামলীলা শারদোৎসবেরই অনুরূপ। দেবী কর্তৃক মহিষাসুর বধ নয়, রাম কর্তৃক রাবণ বধ। সিংহের বদলে হনুমান। অসুর-বধের উল্লাস। এখানে বলে রাখি যে রাবণবধ যেমন উত্তর ভারতীয় হিন্দুদের কাছে চিত্তাকর্ষক মহিষাসুর বধ বাঙালী হিন্দুদের কাছে তেমন নয়। মহিষাসুর কবে কী অন্যায় করেছিল লোকে তা ভুলে গেছে, কিন্তু সীতাকে হরণ করে রাবণ যে অন্যায় করেছিল তা সকলেই মনে রেখেছে। তাই পাপিষ্ঠের পরিণাম দেখে সকলেরই ন্যায়বোধ তৃপ্ত। আর ওই হনুমানটাও সিংহের চেয়ে মহৎ কার্য সম্পাদন করেছিল। সেও লোকচক্ষে দেবতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সিংহ যা পারেনি।

রাসপূর্ণিমা, ঝুলন পূর্ণিমা, কোজাগরী পূর্ণিমা প্রভৃতি নাম থেকে বোঝা যায় এক একটি ঋতুর মতো এক একটি পূর্ণিমাও ছিল পার্বণের আনন্দে আনন্দময়। ধর্মীয় বেশভূষায় সজ্জিত। রামলীলা বছরে একদিন মাত্র, কৃষ্ণলীলা বহুদিন। তবে পাঁজি খুললে দেখা যায় পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবী ও অবতার অবতারিণীরা মিলে বছরের অধিকাংশ দিন অধিকার করেছেন। বৈদিক দেবতারা অদৃশ্য। সৌর উপাসনাই বোধ হয় ভারতীয় আর্যদের আদি উপাসনা ছিল। তার শেষ চিহ্ন বোধ হয় বিহারী হিন্দু মেয়েদের ছট পার্বণ। সূর্যি ঠাকুরের নাম বাঙালী মেয়েদের ব্রতকথায়ও পাওয়া যায়। ব্রতগুলিও প্রিমিটিভ। সম্ভবত ম্যাজিক জাতীয়।

ধর্মের থেকে সংস্কৃতিকে পৃথক করা শক্ত। সেটা যে সম্ভব তা আগেকার দিনে কেউ ভাবতেই পারতেন না। ইদানীং আমরা ভাবছি। কিন্তু আমাদের সেই ভাবনা জনগণের কাছে পৌঁছচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' নোবেল পুরস্কার পেতে পারে, কিন্তু 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' ঘরে ঘরে পঠিত বা প্রচারিত। দেশসুদ্ধ মানুষ হয়তো একদিন কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কালীপূজাও চলবে। শীতলা পূজা, মনসা পূজাও। জনগণের কবিরা শীতলার মহিমা, মনসার ভাসানও লিখবেন। দেবতা, উপদেবতা, অপদেবতা সকলেরই ভক্ত আছে ও থাকবে। তার উপর যোগ করতে হবে সাধুদের, যাঁরা কারো না কারো গুরুদেব, অর্থাৎ দেবতা। অতি ভক্তি থেকে অবতার। পরম ভক্তি থেকে ভগবান। ধর্মপুস্তকের চাহিদাই সব চেয়ে বেশি। কী করে তাকে সাহিত্যের থেকে পৃথক করা যায় ?

না, ধর্মও থাকবে। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতে। কিন্তু ও ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনও তো আছে। বিচিত্র কলার প্রয়োজন। বিভিন্ন দর্শনের প্রয়োজন। বিবর্ধনশীল

বিজ্ঞানের প্রয়োজন। নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োজন। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একে একে রুদ্ধদ্বার খুলে যাচ্ছে। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেন এক একটি হাজারদুয়ারী। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি, অবজারভেটরি প্রভৃতি কত রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান হয়েছে। সংস্কৃতির জগৎ যে কত বৃহৎ তার ইয়ত্তা হয় না। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ হবে। মহাকাশ অভিযানের ফলে যেসব নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে তার প্রভাব পড়বে চিন্তাশীলদের চিন্তার উপর।

যেসব প্রশ্ন নিয়ে মানুষ তিন হাজার বছর আগেও চিন্তিত ছিল সেসব প্রশ্নের সর্বসম্মত উত্তর এখনো মেলেনি। জন্মের পূর্বে সে কোথায় ছিল, মৃত্যুর পরে কোথায় যাবে, স্বর্গ আছে কি না, নরক আছে কি না, জন্মান্তর আছে কি না, অমরত্ব আছে কি না, ঈশ্বর আছেন কি না, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় কি না, তিনি থাকলে এত দুঃখ কেন, এত অন্যায় কেন, এত পাপ কেন, কোথায় প্রতিকার, কবে প্রতিকার, এই দুঃখতাপের সংসার থেকে মুক্তি সম্ভব কি না, কেমন করে সম্ভব, নির্বাণ কী, মোক্ষ কী, স্যালভেশন কী, পরমাত্মার সঙ্গে চিরমিলন কী, এই জগতেই মানব কি অতিমানব হতে পারে, দেবতা হতে পারে, সর্বশক্তিসম্পন্ন হতে পারে, সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে, তার সকল বাসনা-কামনা কি পূর্ণ হতে পারে, সে কি জরাব্যাধি মরণের হাত থেকে চিরকাল বাঁচতে পারে।

এসব প্রশ্ন যদি বিগত তিন হাজার বছরেও অমীমাংসিত থেকে গিয়ে থাকে তবে আগত তিন হাজার বছরেও হবার নয়। মানুষের বাসভূমি এই যে পৃথিবী এ যদি বরফে ঢেকে যায় তো মানুষ কিসের উপর তার স্বর্ণভূমি রচনা করবে? সেটা একটা সুদূর সম্ভাবনা হলেও নিশ্চিত ভবিতব্য। অথচ মানুষ এই পৃথিবীতে যে যার আদর্শ অনুসারে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই নিয়ে কতরকম মতবাদ উদ্‌গত হয়েছে। বেশির ভাগই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের এতখানি প্রভাব মধ্যযুগে ছিল না। কতকটা ছিল প্রাচীন গ্রীসে। এই যে অভিনব প্রভাব এটা অহেতুক নয়। মার্কস, ফ্রয়েড ও আইনস্টাইন আধুনিক মানুষের জীবন উল্লেখযোগ্য রূপে বদলে দিয়েছেন। কবিদেরও এতে অংশ আছে। শেলীর কবিতার উদ্ধৃতি গান্ধীজীকেও দিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তি জুগিয়েছে। শেখ মুজিবর রহমান আমাদের বলেছিলেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে প্রেরণা পেতেন। তাঁর গণভবনের ঘরে ছিল কবির একটি সুদীর্ঘ কবিতার বৃহৎ প্রতিলিপি। আসনে বসলেই নজরে পড়ত।

সবচেয়ে বড়ো প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে দিতে পারেন মুনি ঋষি বা প্রোফেটরাই। দিব্যদৃষ্টি বা অপরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে। এ যুগে তাঁদের অভাব ঘটেছে। তাঁদের পরবর্তীরা মূলগ্রন্থের টীকাভাষ্য লিখতে পারেন, কিন্তু নতুন একখানি উপনিষদ্ বা গীতা বা বাইবেল বা কোরান লিখতে পারেন না। নতুন একখানা ইলিয়াড কি অডিসি কি রামায়ণ কি মহাভারতও না। এ তো গেল লেখার কথা। মধ্যযুগের মন্দির, মসজিদ, গথিক গির্জার মতো মহৎ সৃষ্টিই বা কোথায়? আর একটি তাজমহলও হয়নি। এসব কীর্তি কালক্রমে ধ্বংস হলে এদের স্থান নেবার মতো নতুন কীর্তি কোথায়? একালে

যান্ত্রিক নির্মাণ অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেয়। কিন্তু বোরোবুদুর বা আঙ্কোর বাটের মতো পরম বিস্ময় নয়। একশো তলা, দু'শো তলা ইমারত হবে, কিন্তু সেসব ব্যবহারের জন্য, ব্যবহারের অতীত সৌন্দর্যের জন্যে নয়। সেসবের সঙ্গে তুলনীয় মহৎ কিছু না করে মানুষ যা করছে তা বৃহৎ কিংবা ভয়ঙ্কর। যেমন পারমাণবিক মারণাস্ত্র। দেশের বাজেটে তার জন্যে কোটি কোটির ও বহুগুণ টাকা বরাদ্দ। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির জন্যে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশও নয়।

জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় সারস্বতদের লক্ষ্মীর আরাধনা করতে হচ্ছে। আর্ট হয়ে উঠছে কমার্সিয়াল আর্ট। সাহিত্য ও বাণিজ্যিক সাহিত্য, সঙ্গীত ও ব্যবসাদারী সঙ্গীত। আগেকার মতো রাজসভা বা জমিদার ভবন আর নেই যার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা আপন মনে সাধনা করে যেতে পারেন। আগেকার দিনে অনেকের পারিবারিক সম্পত্তি থেকে আয় ছিল। যেমন রবীন্দ্রনাথের। কারো কারো মাসী বা পিসী কিছু টাকা রেখে যেতেন। যেমন ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফর্স্টারের। চাকরি না নিলেও চলত। চাকরিটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে। যা না হলে নভেল লেখা হয় না। কিন্তু দু'দুটো মহাযুদ্ধের পরে লেখকদের প্রাইভেট ইনকাম বলতে বিশেষ কিছু নেই। তাঁদের লিখে খেতে হয়। নয়তো চাকরি নিয়ে অধিকাংশ সময় ও শক্তি নিঃশেষ করতে হয়। স্বাধীনভাবে লিখে এক হাতে যথেষ্ট উপার্জন করা ও অন্য হাতে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা ভাগ্যবানদের জীবনেই ঘটে। তাঁরা আর ক'জন! অধিকাংশের বেলা স্বাধীনতা থাকে তো স্বচ্ছলতা থাকে না, স্বচ্ছলতা থাকে তো সাহিত্যিক উৎকর্ষ থাকে না। সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বাধীনতার অভাব। স্বচ্ছলতার অভাব নেই। হরে দরে একই কথা। উৎকর্ষ আশানুরূপ নয়।

সংস্কৃতির যে-কোনো বিভাগ কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও চাই। উপরন্তু চাই আর্থিক স্বচ্ছলতা। যে দেশে ও যে যুগে এই তিনটির সুরাহা হয় সে যুগে ও সে দেশে সংস্কৃতির বাগানে হাজার ফুল ফোটে। মহামান্য মাও জে তুং হাজার ফুলের ফরমাস দিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা দিলেন না। তাই ফুল ফুটল না। কিংবা ফুটলেও অকালে ঝরে গেল। তার পরে এল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফরমাস। আমার পরিচিত এক চৈনিক অধ্যাপক দম্পতিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বেজিং থেকে পল্লীতে। অধ্যাপককে মাঠে চাষ করতে হলো। তাঁর লেখিকা পত্নীকে দাসীর কাজ। মজুরি যা দেওয়া হলো তা খোরাকের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বইপত্রের বালাই নেই। বইপত্রের কী দরকার? পড়াশুনা করলে তো চাষী ও মজুরদের সঙ্গে বৈষম্য দেখা দেবে। সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করাই তো সাম্য। মাও মহোদয়ের মহাপ্রয়াণের পর অধ্যাপক দম্পতিকে স্বস্থানে ফিরে আসতে ও স্বকর্মে নিযুক্ত থাকতে দেওয়া হয়। বকেয়া মাইনেও তাঁরা ফিরে পান। সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনদেশের সংস্কৃতির প্রগতি ঘটায়নি। প্রগতির পথ অধ্যাপককে চাষী করে নয়, চাষীর ছেলেকে শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অধ্যাপক করে। চীনদেশের কমিউনিস্টরা এখন সেটা অনুধাবন করতে পেরেছেন।

সামনে হাজার হাজার বছর পড়ে রয়েছে। মানবজাতি পারমাণবিক যুদ্ধে নির্বংশ না হলে সংস্কৃতির ত্রিধারা প্রবহমান থাকবে। একটি ধারা ক্লাসিকাল অথবা মার্গ সঙ্গীতের

মতো মার্গ সাহিত্যের মার্গ শিল্পের। আর একটি লোকসঙ্গীত তথা লোকসাহিত্য তথা লোকশিল্পের। এ ছাড়া আরো একটি পপুলার বা পপ মিউজিকের মতো পপ সাহিত্যের, পপ শিল্পের। একে অপসংস্কৃতি না বলে পপ সংস্কৃতি বললে কেমন হয়? এ জিনিস আগেও ছিল, পরেও থাকবে। সব দেশেই এই চাহিদা আছে। অধিকাংশ ফিল্ম ও নাটক এই শ্রেণীর। সমাজে সাম্য এলেও রুচিতে সাম্য আসবে না। নিম্ন অধিকারীর জন্যে উপদেবতা অপদেবতার মতো নিম্ন রুচির সংস্কৃতিও থাকবে। যতদিন না রুচির উন্নতি হয়। একদিনে হবে না। দিনে দিনে হবে।

'সংস্কৃতি' বলে একটা শব্দ বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। তখন তার ইংরেজী অর্থ ছিল অভিধানকার ম্যাকডনেলের মতে 'preparation'। বেদের পরে যখন ব্রাহ্মণের যুগ এল তখন তার অর্থ হলো ইংরেজীতে 'formation'। তারপরে যখন ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিবর্তন হলো তখন তার অর্থ হলো ইংরেজীতে 'consecration'। দেড় হাজার বছর পরে আবার এই শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অন্য একটি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইংরেজীতে যার নাম 'culture'। আমরা যখন সংস্কৃতি শব্দটি প্রয়োগ করি তখন এই অর্বাচীন বা অধুনাতন বা বিদেশী অর্থেই করি।

আর ওই যে কালচার কথাটি ওটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিনব অর্থে প্রয়োগ। সিভিলাইজেশন কথাটিও তাই। তার মানে কিন্তু এ নয় যে কালচার বা সিভিলাইজেশন নামক বস্তুটা মানব-ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। ছিল, হাজার হাজার বছর ধরে বহমান। কিন্তু দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত ছিল। সর্বসম্মত নাম ও অর্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিদগ্ধ মহলেই প্রথম প্রচলিত হয়। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের, চীনের, জাপানের, পারস্যের, মিশরের, পশ্চিম এশিয়ার বিদগ্ধ মহলে। যে যার নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত করে নেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্বানরা সিভিলাইজেশনের ভাষান্তর করেন সভ্যতা। আর বিংশ শতাব্দীতে কালচারের ভাষান্তর প্রথমে কৃষ্টি, পরে সংস্কৃতি। এই শব্দটি আমাদের সমসাময়িকরা যে অর্থে ব্যবহার করেন সে অর্থ কালচারের সমান। তার মানে কিন্তু এ নয় যে কালচার আমাদের দেশে নবাগত বা বহিরাগত। কালচার বরাবরই ছিল, কিন্তু এইভাবে চিহ্নিত ছিল না।

আমাদের আগে কেউ কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছেন যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে বোঝাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ নয়, রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ নয়, নাচ গান অভিনয়? আর সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি হবেন একজন সাহিত্যিক, প্রধান অতিথি একজন সম্পাদক আর উদ্বোধক একজন রাজনৈতিক? উদ্বোধক মহাপ্রভু পাঁচ মিনিট বাদে অন্তর্ধান করবেন, দশ মিনিট বাদে প্রধান অতিথি মহারাজ, সভাপতি তো তাঁদের মতো কাজের লোক নন, সাহিত্য কি একটা কাজ নাকি? সুতরাং তাঁকেই অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ না শেষতম বক্তা তাঁর বক্তব্য 'রাখছেন'। এর পরে আসল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তখন সভাপতিকে মঞ্চ থেকে নেমে আসতে হয়। লোকটা থাকল কি গেল কেউ ফিরেও তাকায় না। উদ্যোক্তারা হয়তো দয়া করে ট্যাক্সি ডেকে দেন, খরচাটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে যান। নয়তো তাঁকেও দেখবার জন্যে ধরে রাখেন।

একদা আমরা শান্তিনিকেতনে 'সাহিত্যমেলা'র উদ্যোগ করেছিলুম। এখন দেখছি

মেলার সঙ্গে সংস্কৃতি জুড়ে দিয়ে 'সংস্কৃতিমেলা' বসছে। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার মতো বিরাট ব্যাপার। আনন্দের বিষয় বইকি। কিন্তু জনতা না হলে এসব জিনিস জমে না। নজরটা জনতার উপরে। কেমন করে জনতাকে টানব। কান টানলে যেমন মাথা আসে, জনতাকে টানলে তেমনি টাকা আসে। সে টাকার বখরা গাইয়েকে দেব, বাজিয়েকে দেব, নাচিয়েকে দেব, নটনটীকে দেব, কিন্তু সাহিত্যিককে দিলে তাঁর অসম্মান হয়।

জনতাকে আকর্ষণ করতে চাইলে জনতার কাছে আকর্ষণীয় হওয়া চাই। হিন্দী ফিল্ম তার সেরা দৃষ্টান্ত। হিন্দী চিত্রনির্মাতারা লাজলজ্জার ধার ধারেন না। যাঁদের ধার ধারেন তাঁরা কোটিপতি মহাজন। তাঁদের ধার শোধ করতে হলে জনতাকে লাখে লাখে টানতে হয়, সেই সঙ্গে লাখো লাখো টাকা। রুচিবোধ, রসবোধ, নীতিবোধ, দার্শনিকতা, মতবাদ ইত্যাদির জন্যে হিন্দী ফিল্ম নির্মাতারা বিখ্যাত নন। তাই যে জিনিস তাঁদের স্টুডিও থেকে বেরোয় তা একপ্রকার ভোগ্য পণ্য। জনতা সস্তায় পায়, তাই সিনেমায় ভিড় করে। বাংলা ফিল্ম নির্মাতাদের কারো কারো রুচিবোধ ও রসবোধ আছে। তাই তাঁরা লোকসান দিয়েও এমন সব ফিল্ম তৈরি করেন যা সমঝদারদের বিচারে উৎকৃষ্ট। শুধু এদেশে নয়, সব দেশে। কিন্তু জনতার রুচি না বদলালে তাঁদেরকেও জনতার রুচির সঙ্গে আপস করতে হবে, জনতা যেমনটি চাইবে তাঁরাও তেমনটি সরবরাহ করবেন। নয়তো তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করা দুষ্কর হবে। এক যদি রাষ্ট্র সে দায়িত্ব নেয়। রাষ্ট্রও তো জনগণের রাষ্ট্র। তার রুচিও তো জনগণেরই রুচি। অথবা জনগণের প্রতিনিধি বলে যাঁরা পরিচয় দেন তাঁদেরই রুচি। থাকতে পারে তাঁদের একটা মহত্তর আদর্শ বা মিশন, কিন্তু লোকে যদি টাকা দিয়ে টিকিট না কাটে সিনেমাও তো হবে একটা রুগ্ন শিল্প।

ত্রিশ বছর আগে কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অবস্থাও ছিল রুগ্ন শিল্পের মতো। শুনেছি অবিভক্ত বঙ্গের শেষ প্রধানমন্ত্রী সুহরাবর্দী সাহেব একটি সৎ কার্য করে যান। অ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্সের হাত থেকে রেহাই দেন। তখনকার মতো তারা বেঁচে যায়। পরে থিয়েটারের আকর্ষণীয়তা বাড়ে। লোকে কেবল সিনেমা দেখে সন্তুষ্ট থাকে না। থিয়েটারে গিয়ে জীবন্ত অভিনয় দেখতে চায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আশা করে নানারকম তুকতাক কলাকৌশল। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, ধ্বনিবিস্তার, আরামপ্রদ আসন। আরো কত কী। ভদ্রঘরের অভিনেত্রীরা এসে আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দেন। তাঁদের উন্নততর স্বাচ্ছন্দ্যের মান রক্ষা করতে গিয়ে প্রযোজনার ব্যয়ও আরো বেড়ে যায়। বাড়ী ভাড়া বাড়তে বাড়তে আকাশ ছোঁয়। থিয়েটার মালিকদের বা সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা তাঁদের এই শিক্ষাই দেয় যে একখানা নাটক যদি এক বছর বা দু বছর বা তিন বছর না চলে তবে লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশি। কোথায় পাওয়া যায় সেরকম নাটক। শরৎচন্দ্র ভাঙিয়ে আর কতকাল চলবে! এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মালিক ও কর্মীরা নাজেহাল। নাচ গান আগেও ছিল, কিন্তু ক্যাবারে ছিল না। তাকে নাটকের মাঝখানে অকারণে আমদানি করতে হলো। যাঁরা নাটকের টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলেন তাঁরা সেই খরচে ক্যাবারের আনন্দও পেলেন।

এমনি করে এগোতে এগোতে যেখানে এসে পৌছানো গেল তার নাম রাখা হয়েছে অপসংস্কৃতি। এটা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নেওয়া নাম নয়। অথবা নয় বিদেশী ভাষা থেকে নেওয়া নামান্তর। ইংরেজী কালচার শব্দের পূর্বে অমন কোনো উপসর্গ বা বিশেষণ বসানো হয় না। 'অপসংস্কৃতি' হচ্ছে বাঙালীর মস্তিষ্কের অবদান। বাংলা আজ যা ভাবে ভারতের অন্যান্য রাজ্য কাল তাই ভাববে। সুতরাং শব্দটার ভবিষ্যৎ আছে। যদি বস্তুটার ভবিষ্যৎ থাকে। থাকবেই, কারণ থিয়েটার-সিনেমায় আয়ব্যয়ের সমতা রাখতে হলে দর্শকদের জোগাতে হবে নাইট ক্লাবের আনন্দ। যার প্রধান উপাদান নগ্ন নারীদেহ। সে নারী ভদ্রঘরের হলে তো আরো বেশি উদ্দীপনা। একে একে আসবে চুম্বন আলিঙ্গন থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু। পশ্চিমে ও জাপানে এসেছে বা আসি-আসি করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চের আলো নিভে যাবে বা আলো-আঁধারি হবে। তা না হলে অভিনয় বস্তুনিষ্ঠ হবে কী করে?

দর্শকদের আকর্ষণ করে একদিক থেকে যেমন যৌন আবেদন, তেমনি আরেক দিক থেকে হত্যাবিভীষিকা বা আতঙ্কে রোমহর্ষণ। ডিটেকটিভ নভেল বা হরর কমিক্স যা আরো সস্তায় জোগায়। পশ্চিমে বড়ো বড়ো লেখকরাও বেনামিতে খুনখারাপির উপাখ্যান লেখেন। পড়েন যাঁরা তাঁরাও স্বনামধন্য। শ্রীযুক্তা দেবী চৌধুরানী যখন শুতে যেতেন তখন তাঁর সুনিদ্রার সহায় হতো বিলিতী ডিটেকটিভ নভেল। তার বিষয়বস্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নয়। 'ঈশ্বর কে' নয়, 'হত্যাকারী কে'? আজকাল পশ্চিম দেশে ডিটেকটিভ নাটকও হয়েছে। আমাদের এক বন্ধু এদেশেও তার সূত্রপাত করেছিলেন, কতদূর সফল হলেন বলতে পারব না। ওদিকে আগাথা ক্রিষ্টির 'মাউসট্র্যাপ' তো বিশ বছরের উপর সমানে চলছে বা চলেছিল। বিভীষিকা নিয়ে বেসাতিকে অপসংস্কৃতি না বলে কী বলা উচিত?

বিলেতের এক প্রকাশক বছর কয়েক আগে 'নিউস্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর বক্তব্যের মর্ম হলো, আজকাল প্রকাশনের ব্যয় এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে দশ হাজার কপি না ছাপলে খরচ পোষায় না। ক'খানা উপন্যাস আছে যার ক্রেতার সংখ্যা দশ হাজার? উপন্যাস লেখা তো উঠেই যাবে, যদি না প্রকাশকদের পরামর্শে লেখকরা কথায় কথায় যৌন প্রেরণার অবতারণা করেন। এসব উপন্যাস আগেকার দিনের প্রেমের উপন্যাস নয়। খোলাখুলি কামের উপন্যাস। কী করা যায়? প্রকাশক তো আর লোকসানের কারবার করতে পারেন না। বহু প্রকাশক এখন উপন্যাস ছেড়ে ইতিহাস, জীবনী, প্রবন্ধ পছন্দ করেন। দেখা যাচ্ছে লোকসান দিতে হয় না। দশ হাজার কপি বিকোয়।

অপসংস্কৃতি ছাড়া আরো একটা সংস্কৃতি আছে, সেটা না থাকলে সব বিলিতী প্রকাশকই সব ঔপন্যাসিককে সেই পরামর্শ দিতেন। নতুবা বইয়ের ব্যবসা তুলে দিয়ে পোশাকের ব্যবসা করতেন। এদেশের প্রকাশকদেরও সামনে একই সমস্যা। প্রকাশনের খরচ যে হারে বেড়ে যাচ্ছে হাজার পাঁচেক কপি না ছাপলে লাভ তেমন হয় না। অগত্যা গরম মশলা মেশাতে হয়। বাঙালীর পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে ও জিনিস আদৌ

ছিল না একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। এখন যে অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে তাও নয়। অথচ আজকের দিনের বাংলা কথাসাহিত্যের যোদ্দা কথাটাই তো হলো ওই। তা নইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তার জন্যে লিখতে হয় আরেক রকম উপন্যাস। সেটা অপসংস্কৃতি নয়, আরেক রকম সংস্কৃতি। বই বিকোয়, প্রকাশনের খরচা পোষায়, পাঠক-পাঠিকার চরিত্রহানি হয় না, লেখকেরও ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ লাভ হয়। চতুর্বর্গ নয়, ত্রিবর্গ ফল। মাঝখান থেকে বিপন্ন হয়েছে সত্যিকার সংস্কৃতি। সেসব গ্রন্থের পাঠকসংখ্যা কম বলে প্রকাশক মেলা ভার।

এখানে বলে রাখি যে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি একার্থক নয়। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা করতে পারা যায়। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। তার সংজ্ঞা যে কী তাও নির্ধারিত হয়নি। কিছুদিন আগে একখানি নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে অপসংস্কৃতির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগটা আইনগ্রাহ্য নয়। সেটাকে আইনের আমলে আনতে হলে সোজাসুজি নালিশ করতে হতো যে বইখানা অশ্লীল বা যেভাবে তার অভিনয় হচ্ছে সেটা অশ্লীল বা অশালীন। আগেকার দিনে নাট্যাভিনয়ের উপর কড়া সেন্সরশিপ ছিল। বইখানা হয়তো আপত্তিকর নয়, অথচ তার অভিনয় পুলিশের মতে আপত্তিকর। পুলিশের লোক তার আপত্তিকর অংশগুলি কেটেকুটে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করত। কলকাতায় তো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নেই। পুলিশ কমিশনারই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাভোগী। একবার আমার কাছে একখানি নাটক হাজির করা হয়। কাটাকুটি দেখে আমি তো হেসেই কুটিকুটি। পুলিশের রসবোধ আমার রসবোধ নয়। আমি কী করি? পুলিশকে একেবারে অপ্রতিভ করা যায় না। ওরা যা করেছে রাজশক্তির মুখ চেয়ে করেছে। সাহিত্যের মুখ চেয়ে নয়। আর আমিও তো তাই করতুম, যদি না সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিতুম। আমাকে তাই আপস করতে হলো। কে জানে হয়তো টিকটিকিরা লাগাত যে আমিও প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহী।

স্বাধীনতার পরে চাকরির ধড়াচূড়া খুলে ফেলার পর নাট্যাভিনয়ের সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের মতো আমিও দু কথা বলি বা লিখি। ফলে নাট্যাভিনয়ের উপর সেকালের মতো সেন্সরশিপ উঠে যায়। অন্তত আমার তো সেইরূপ ধারণা। আগেকার দিনের ধারা অব্যাহত থাকলে পুলিশ কমিশনারই নাট্যাভিনয়ের আপত্তিকর দৃশ্য বা শ্রাব্য ছাঁটাই করতেন। যদি তাঁর কাছে সেই মর্মে রিপোর্ট যেত। আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নেই, তাই জোর করে বলতে পারছিনে যে নাট্য-প্রযোজক নিরঙ্কুশ ও পুলিশ কমিশনার ঠুঁটো জগন্নাথ। কিন্তু অবস্থা যদি সত্যি সেরকম হয়ে থাকে তবে আবার সেই পুরোনো আইন ফিরে আসতে পারে। পুলিশের ছাড়পত্র না নিয়ে কিছুই মঞ্চস্থ করতে পারা যাবে না। জনমত যদি সরকারী হস্তক্ষেপ চায় তো সরকারী স্থূল হস্তাবলেপই আছে নাট্য-প্রযোজকের কপালে। নাটকটির কথা আলাদা। এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি যে নাটকটি অশ্লীল।

আমার এক বন্ধু ওই নাটকটির অভিনয় দেখেছেন তিন বার। তাঁর মুখে শুনেছি প্রথম

বারের অভিনয় নির্দোষ ছিল। পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেখতে পারা যেত। কিন্তু দ্বিতীয় বারে অভিনয়ে আবিলতা প্রবেশ করে। সবাইকে নিয়ে দেখতে পারা যায় না। তৃতীয় বার তিনি সবাইকে নিয়ে নয়, স্ত্রীকে নিয়ে যান। দেখেন দস্তুরমতো বেলেল্লাপনা। এই অধোগতির কারণ কী হতে পারে? অভিনেতারা ভদ্রসন্তান। অভিনেত্রীরাও আজকাল ভদ্রঘরের কন্যা বা বধূ। কার সেবা করছেন এঁরা? আর্টের সেবা নয় নিশ্চয়। এর ইংরেজী নাম আর্ট নয়, পর্নোগ্রাফি। আমরা যারা আর্টের সেবায় নিবেদিত তারা পর্নোগ্রাফির পক্ষ নিয়ে লড়তে পারব না।

আর্ট কোথায় শেষ হয়েছে আর পর্নোগ্রাফি কোথায় শুরু হয়েছে তার সীমানা নির্দেশ করা সহজ নয়। একদা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন তাঁরই বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল। বইখানা রবীন্দ্রনাথ শুধরে দেননি, সেটা এখনো সেইরকম আছে। কিন্তু সেটাকে যখন তিনি নৃত্যনাট্যরূপ দেন তখন আমি অবাক হয়ে দেখি শেষ দৃশ্য অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার বিবাহ। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মতো গান্ধর্ব বিবাহ নয়, শাঁখ বাজিয়ে সকলের সামনে আনুষ্ঠানিক বিবাহ। কবিকে ধন্যবাদ যে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে খুশি করার জন্যে বইখানার উপর অঙ্কুশ চালাননি। কিন্তু এ যা করেছেন এটা আর্টের খাতিরে নয়। এটা বালিকাদের অভিভাবকদের মুখ চেয়ে।

এটা হলো চল্লিশ বছর আগেকার কথা। এই চল্লিশ বছরে সমাজের মূল্যবোধ কি সম্পূর্ণ উল্টে গেছে? তখনকার দিনে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে ভদ্রমহিলাদের পাওয়া যেত না। সতাদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন পতিতারা। এখন পতিতাদের বা ব্যভিচারিণীদের ভূমিকায় অভিনয় করেন সতীরা। দ্বিজেন্দ্রলাল বেঁচে থাকলে মূর্ছা যেতেন, রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "মা ধরণী—"। আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনো অন্যায় দেখিনে। যে ভূমিকায় যাকে মানায় সে ভূমিকায় সে অভিনয় করবে। অভিনেতাদের বেলা কি আমরা এই বলে দোষ ধরি যে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নেমেছে লম্পট ও মাতাল? বা শয়তানের ভূমিকায় সত্যিকার সজ্জন? অভিনয় দেখে বোঝবার উপায় নেই, আসলে কে কী রকম।

নাটকের পাঠ থেকে যেমন মন্দ চরিত্রদের বর্জন করতে পারা যাবে না তার অভিনয় থেকেও তেমনি ভদ্রঘরের নর-নারীদের বহিষ্কার করতে পারা যাবে না। পারা উচিতও নয়। অভিনয়ের উৎকর্ষই এক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি। পশ্চিমে কেউ কারো প্রাইভেট লাইফ নিয়ে মাথা ঘামায় না। অভিনয় দেখতে এসেছ, ত্যাখো। ভালো না লাগে তো এসো না। সিনেমায় এদেশেও সেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। থিয়েটারেও হবে। সতীরাই কেবল সতীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন, পতিতারাই কেবল পতিতার ভূমিকায় বা ব্যভিচারিণীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন, দুর্জনরাই কেবল দুর্জনের ভূমিকায় অভিনয় করবেন, সুজনরাই কেবল সুজনের ভূমিকায় অভিনয় করবেন, এরূপ বিধান ভরত নাট্যশাস্ত্রে বা অন্য কোনো শাস্ত্রে নেই। থাকতে পারে না। কারণ অভিনয়ের অর্থই হচ্ছে যা নয় তাই। বৃদ্ধ বয়সেও সারা বার্নার্ড সাজতেন কিশোরী জুলিয়েট। রোমিওটি হয়তো নাতির বয়সী। নটী বিনোদিনী সাজতেন চৈতন্যদেব। শিশির ভাদুড়ী সাজতেন

আলমগীর। রবীন্দ্রনাথ সাজতেন অন্ধ বাউল। খুঁত ধরতে হলে ধরতে হয় তাঁদের অভিনয়ের বা সাজসজ্জার। প্রাইভেট লাইফ এক্ষেত্রে অবান্তর।

মঞ্চেরও তেমনি কতকগুলো কনভেনশন আছে। জীবনে যা দেখা যায় রঙ্গমঞ্চে তা দেখানো সম্ভব নাও হতে পারে, সম্ভব হলেও সংগত নাও হতে পারে। নাটকে হয়তো চলে, কিন্তু নাট্যাভিনয়ে অচল। তবে কনভেনশনও দেশ অনুসারে কাল অনুসারে ভিন্ন। সিনেমা নামক 'শিল্প'টি এক শতাব্দী পূর্বেও ছিল না। সিনেমার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে থিয়েটারও তার অনুকরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তো টেলিভিসন বলে আরো এক 'শিল্প' এসে উপস্থিত। শুনতে পাই আমেরিকার বড় কেউ সিনেমা দেখতে যায় না। যে যার ঘরে বসে টেলিভিসন দেখে। থিয়েটারেরও হয়তো সেই দশা হবে। সেটা এড়ানোর জন্য থিয়েটার যদি নাইট ক্লাবের অনুকরণ করে তাহলে কী করেই বা তাকে বলি "থিয়েটার, তুমি আত্মরক্ষা কোরো না। তুমি তোমার আত্মাকে রক্ষা কোরো।" এ সমস্যার সমাধান এত কঠিন যে রাষ্ট্র থেকে অনুদান দিয়েও এর সুরাহা হবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত থিয়েটারও এ প্রশ্নের সদুত্তর নয়। থিয়েটারকে আকর্ষণীয় করতে হবে, অথচ বেলেল্লাপনা দিয়ে নয়। বিভীষিকা দিয়ে নয়। সেটা সুনিশ্চিতভাবেই অপসংস্কৃতি।

আমার এক বন্ধুর বিশ্বাস ধনতন্ত্রই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। গোড়ায় কোপ দাও। তাহলে দেখবে অপসংস্কৃতিও হাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ লোকের রুচির উন্নতি নাহলে সমাজতন্ত্রও কি সাধারণকে কেবল শ্রেণীসংগ্রামের মন্ত্র পড়িয়ে শান্ত করতে পারবে? রুচির দিক থেকে তারা যে তিমিরে তারা সেই তিমিরে। সবকিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত করে অপসংস্কৃতি রোধ করা সম্ভব, কিন্তু সংস্কৃতির প্রবেশপথ কি একই কালে রুদ্ধ হবে না? নাচ গান বাজনায় নরনারীর চরিত্রহানি ঘটতে দেখে ইসলাম নাচ গান বাজনা বন্ধ করে দেয়। চরিত্র হয়তো রক্ষা পেলো, কিন্তু নৃত্যগীতবাদ্যের চর্চাও হলো না।

আগেকার দিনে ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা না হলে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতসাধনা সম্ভব হতো না। দুর্গোৎসবও ছিল ধনীদের প্রসাদনির্ভর। থিয়েটারও তো ধনীদেরই দৌলতে আরম্ভ হয়। সব দেশেই এই ইতিহাস। ব্যালে কিংবা অপেরার পেছনে যে জীবনব্যাপী সাধনা সে সাধনার পেছনে অভিজাতদের মুক্তহস্তে অর্থব্যয়। সেই শ্রেণীটাই লোপ পেয়ে গেছে বা যাচ্ছে। সুতরাং অপর এক শ্রেণীর উপরেই বর্তেছে বা বর্তাচ্ছে এখন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা। অপর শ্রেণীটি আপাতত বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইতিহাসের মঞ্চ থেকে এরও বিদায় ঘটবে। তখন এ দায় যাদের বহন করতে হবে তারা অন্য একটি শ্রেণী। তাদের বলা হয় প্রোলিটারিয়ান। বিপ্লবের জন্যে যারা অধীর নয় তারাও উপলব্ধি করছে যে, অঙ্কস্য বামা গতিঃ। ইতিহাসও তেমনি বামদিকে গতিশীল। ইতি-মধ্যেই আমরা বামপন্থীদের ভোট দিয়ে মঞ্চে বসিয়ে দিয়েছি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গণতন্ত্রও সাধারণ লোকের ইচ্ছানির্ভর। ধনীদের প্রতাপ চিরন্তন নয়। লোকে যখন আরো সচেতন হবে তখন ধনীদের খুশিমতো নয়, নিজেদের খুশিমতো ভোট

দেবে। তখন তারা যদি ধনতন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রের মতো উচ্ছেদ করতে চায় সেটাও সম্ভব।

কিন্তু সংস্কৃতি কি তার নিজের দমে চলে না পরের দেওয়া দমে? একজন হোমার কি বাল্মীকি, কালিদাস কি দান্তে, শেক্সপীয়র কি লিওনার্দো, নিউটন কি বেঠোভেন, টলস্টয় কি রবীন্দ্রনাথ কি এঁর ওঁর তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার জন্যেই অমর? না এঁদের অমরত্বের মূলে আর কোনো শক্তি সক্রিয়? প্রোলিটারিয়ানদের হাতে ক্ষমতা আসার পর অর্ধশতাব্দী অতীত হয়েছে। কই, ক'জন শিল্পীকে তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মহান করে দিতে পেরেছে? নতুন নতুন আর্ট ফর্মই বা কোথায়? অভিজাত যুগের উত্তরাধিকার বাদ দিলে তাদের স্বোপার্জিত সাংস্কৃতিক সম্পদ কী পরিমাণ? বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির অপপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ওরা হয়তো বেঁচে গেছে, কিন্তু ওদের বংশধরদের জন্যে রেখে যাচ্ছে কোন্ সুসংস্কৃতির উত্তরাধিকার? আমাদের এদেশে তো প্রোলি-টারিয়ান কালচারের রূপরেখার আভাসটুকুও পাচ্ছিনে। শ্রেণীবিদ্বেষ বা পরনিন্দার উপর একটা স্বনির্ভর কালচার গড়ে উঠতে পারে না। ধ্বংসের অধিকার তারই জন্মায় যে সৃষ্টির সাধনায় তৎপর। কোথায় সেই সৃষ্টির সাধনা যাকে 'পীপলস' বলে চিহ্নিত করতে পারি? চোখে যেটা পড়ে, কানে যেটা আসে সেটা পপুলার ও ভালগার। জনতাও তার জন্যে কম দায়ী নয়, কারণ জনতাই বাজে সিনেমার, বাজে থিয়েটারের বাজে যাত্রার টিকিটের জন্যে ভিড় করে। সুসংস্কৃতির জন্যে দাম দিচ্ছে কারা?

সুসংস্কৃতির উপভোক্তা সর্বসাধারণ, কিন্তু স্রষ্টা শতকরা একজনেরও কম। সেই ক'জনের উপর দৃষ্টিপাত না করে কেবল যদি অপসংস্কৃতির অপস্রষ্টাদের নিয়ে রাজ্য তোলপাড় করা হয় তবে অপসংস্কৃতির বিজ্ঞাপনের কাজও হয়ে যায় বিনা খরচায়। অথচ তাদের শাস্তি দেবার মতো মনের জোরও নেই। দিলে প্রভাবশালী মহলে অপ্রিয় হতে হয়। জনমত ওভাবে তৈরি হতে পারে না। অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা কী, নমুনা কী, কেন বর্জনীয়, কেন দণ্ডনীয়, এসব খুলে বলতে হবে। তা শুনে প্রতিপক্ষও আত্মসমর্থন করতে পারে। প্রতিপক্ষের বক্তব্যও শ্রবণ করতে হবে, খণ্ডন করতে হবে। এর জন্যে চাই একটা তর্কসভা বা সেমিনার, যাতে যোগ দেবার জন্যে বিভিন্ন মতের বুদ্ধিজীবীদের আমন্ত্রণ করতে হবে। কেবল একপক্ষের অভিযোক্তাদের নয়। আমার তো মনে হয় অভিযুক্তদেরও আহ্বান করা উচিত। তাদের বক্তব্যও প্রণিধান করা উচিত।

অপসংস্কৃতির পক্ষপাতী আমরা কেউ নই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা তার বিনাশের জন্যে যে অস্ত্রটি শাণিত হচ্ছে সেটি একদিন আমাদের ঘাড়েও পড়বে। কারণ আমরাও তো জীবনের সব দিক দেখাতে গিয়ে কায়িক দিকটিও দেখাচ্ছি। মানুষের যেমন মন আছে, প্রাণ আছে, আত্মা আছে, তেমনি দেহ আছে, দেহের কামনা বাসনা আছে, দেহের আনন্দ বেদনা আছে। পূর্ণ সত্য প্রকাশ করতে চাইলে একটা দিক সম্পূর্ণ ঢেকে রাখা চলে না। এটা ব্যবসাদারি নয়, এর পেছনে অর্থকরী মনোভাব নেই, এটা বুর্জোয়া শ্রেণীতে জন্মানোর জন্যেও নয়। এটা একটা করণীয় কাজ। শ্রমিকশ্রেণীতে যাঁদের জন্ম তাঁরাও এ কাজ একদিন করবেন। তখন তাঁদের ঘাড়েও খাঁড়া নেমে আসতে পারে। খাঁড়া জিনিসটাই বিপজ্জনক। সেটাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেওয়া কারো পক্ষে

নিরাপদ নয়।

পতিতারাও নারী। তারাও মানুষ। তাদের সুখদুঃখের কথা সাহিত্যে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? কী জলন্ত বিবেকের সঙ্গে লেখা টলস্টয়ের মহৎ উপন্যাস 'রেসারেকশন'। ডস্টয়েভস্কির 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ'-এ কী গভীর দরদের সঙ্গে আঁকা গ্রুশেঙ্কা, যে দণ্ডিত অপরাধীর সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যায়। বাংলা সাহিত্য এখনো ওদের নিয়ে সেন্টিমেন্টালিটির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তবু সেও ভালো। যেটা ভালো নয় সেটা খদ্দের পাকড়াবার জন্যে থিয়েটারে বেলেল্লাপনা। সেটাও একপ্রকার পতিতাবৃত্তি। কৌতূহলী জনতাই সেটার পৃষ্ঠপোষক। অভিজাতরা নন। সংস্কৃতিমান মধ্যবিত্তরাও নন।

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সারাজীবনের সাধনা। ভারতের ইতিহাসে গণিকা ও দেবদাসীরাই এযাবৎকাল তার দায়-দায়িত্ব বহন করে এসেছে। কুলবধূদের তার জন্যে সময়ও ছিল না, সুযোগও ছিল না, হয়তো অভিরুচিও ছিল না। ইদানীং বহু ক্ষেত্রে অভিরুচির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, কেবল বালিকাবয়সে নয়, বিবাহের পরেও। বহু ক্ষেত্রে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সমাজ অনেক বেশি উদার হয়েছে। কিন্তু সাধনার উপযুক্ত সময় দিতে পারে কজন! সন্তান হলে তার দায়-দায়িত্ব নেবে কে? উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষা বহুজন আরম্ভ করে দিলেও এক-আধজনই জীবনভর অবিরাম চালিয়ে যেতে পারে। যদি অর্থাভাব না থাকে। পশ্চিম দেশে কনসার্টের ব্যবস্থা আছে। সেটাই সঙ্গীতসাধিকাদের জীবিকা। কনসার্ট হলে কনসার্ট হয়। হয়তো একজনের বেহালাবাদন বা কণ্ঠসংগীত। শ্রোতারা টিকিট কাটে। সেইভাবে অর্থোপার্জন চলে। ধনী পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন হয় না। ধনতন্ত্রকে এর মধ্যে টেনে আনার দরকার দেখিনে। এঁরা কেউ গণিকা নন, রক্ষিতা নন, সমাজের চোখে হেয় নন। আজকাল অর্কেস্ট্রাতেও মহিলাদের বেহালা কিংবা চেলো বাজাতে দেওয়া হয়। এক-এক করে সব দুয়ার খুলে যাচ্ছে। এ যুগটা কেবল শূদ্রজাগরণের যুগ নয়, নারীজাগরণেরও যুগ। বিশ্বময়।

একটু আগেই বলেছি যে, সুসংস্কৃতির উপভোক্তা সর্বসাধারণ, কিন্তু স্রষ্টা শতকরা একজনেরও কম। এঁদের যদি পৈতৃক বিত্ত না থাকে, যদি স্বোপার্জনের সুযোগ বা অবকাশ না থাকে তবে এঁদের সাধনা শুরু হতে না হতে অকালে সাঙ্গ হবে। প্রায়ই তো দেখতে পাই যিনি হতে পারতেন সার্থক কবি তিনি হয়েছেন চলনসই উকিল। কালেভদ্রে দুটো একটা কবিতা লিখে নিয়মিত সাধনার ফল লাভ হয় না। সঙ্গীতে নৃত্যে অভিনয়ে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে সর্বত্র প্রথম প্রতিশ্রুতির দীপ্তি। তারপর লাইনচ্যুত হয়ে কেউ হয় ডাক্তার, কেউ হয় মাস্টার, কেউ হয় ঠিকাদার, কেউ করে গিন্নিপনা। রাজসভার বা দেবমন্দিরের বা মঠবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতা আর নেই। থাকতে পারত এনডাউমেন্টের বা ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্য। যদি সংস্কৃতির প্রতি ধনীদের দায়িত্ববোধ থাকত। যেমন আছে ধর্মের প্রতি। এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে আমরা শুধু সরকারের দুয়ারেই ধর্না দিচ্ছি। আর ভাবছি সমাজতন্ত্রী সরকার কায়েম হলেই গুণীজনের গুণের আদর হবে আর গুণীজন অব্যাহতভাবে তাঁদের মনোনীত কলাবিদ্যার চর্চা করবেন। তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা তাঁদের নিয়তি নিয়ন্ত্রিত হবে না। ভিন

দেশের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলে।

অপসংস্কৃতির পক্ষে একটা জোরালো যুক্তি এই যে, ময়রার দোকানের মতো সে স্বাবলম্বী। সরকারের সাহায্যের জন্যে সে হাত পাতে না। তার খুঁটির জোর জনতার আগ্রহ। আর এটাও একটা পরীক্ষিত সত্য যে জনতার আগ্রহ একদিনে বা এক মাসে বা এক বছরেও ফুরোয় না। কোটি কোটি মানুষ যদি একই নাটকে আগ্রহী হয় তো একটানা দশ বিশ বছর ওই নাটকই বাজার মাত করতে পারে। ততদিনে সরকার বদল বিচিত্র নয়। অপসংস্কৃতির বিপক্ষে যাঁরা আসরে নেমেছেন ততদিনে তাঁদেরও গলার জোর ক্ষীণ হয়ে থাকবে, কলমের নিব ভোঁতা হয়ে থাকবে। অপসংস্কৃতি যে টিকে থাকবে তার নিশ্চয়তা কোন্‌খানে? নিশ্চয়তা স্বাবলম্বনে। আর স্বাবলম্বনের স্থিরতাই বা কোথায়? স্থিরতা জনতার রুচিতে।

জনতার রুচি পরিবর্তনের কঠিন কাজে কি কারো উৎসাহ আছে? অধ্যবসায় আছে? যদি কারো থাকে তবে তিনিই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। ছেলেবেলায় আমাকে মিষ্টি কিনতে দেওয়া হতো না এই বলে যে, বিবেকানন্দ বলেছেন ময়রার দোকান বিষ। মিষ্টি খাওয়া যদি আমি বন্ধ করে থাকি তো ছেলেবেলায় পয়সার অভাবে ও বড়ো হয়ে বহুমূত্রের ভয়ে। বিবেকানন্দের উপদেশে নয়। বিতর্কিত নাটক দেখতে যারা যাচ্ছে না তাদের হয় পয়সার অভাব, নয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যাবার ভয়। ওইটুকু চক্ষুলজ্জা এখনো আছে। তা বলে ছেলেমেয়েরা যে লুকিয়ে দেখছে না তা নয়। ইংরেজী 'এ' চিহ্নিত ফিল্ম দেখতে ভিড় করে নাবালক-নাবালিকারাও কম নয়। বাপ মার অজান্তে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে দীর্ঘকাল তর্ক করার পর এখন এ বয়সে আমি আর ওর বিপক্ষে তর্ক করতে পারিনে। সে ইচ্ছাই আর নেই। আমি শুধু মনে করিয়ে দেব যে, স্বাধীনতা মানে দায়িত্বহীনতা নয়। স্বাধীনতার অপব্যবহার পরাধীনতা ডেকে আনে। বাচ্চারা যদি দুধ খেতে না পায় তো বুড়োদের রসগোল্লা খাওয়ানোর স্বাধীনতায় সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য হবে। তখন ময়রার দোকান তেমন অর্থকরী হবে কি? অনেক দোকানই উঠে যাবে। একই দশা ঘটতে পারে সিনেমার, থিয়েটারের, যাত্রার, যদি দেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়। অপসংস্কৃতির কর্ণধারদের কর্ণ-মর্দন আসন্ন না হলেও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুসংস্কৃতির সত্র খুলে দিতে হবে। ভুলে যেতে হবে কার ক মতবাদ, কে কোন্ পার্টির সদস্য। মনে রাখতে হবে কার কী সাধনা ও কার কী সাধ্য।

—